আমরা বড় হই বড় হবো

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

আগত ও অনাগত
'ওয়াকফে নও' তথা নব জীবন উৎসর্গকারীগণের
উদ্দেশ্যে নিবেদিত

– মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

শুভেচ্ছাসহ

---------- কে

প্রকাশক ঃ
ডাঃ আহমদ আলী
প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট,
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়া
গ্রাম ও ডাকঘর ঃ তারুয়া
জেলা ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রকাশকাল ঃ
রবিঃ সানি ঃ ১৪১৮ হিঃ
ভাদ্র ঃ ১৪০৪ বাং
আগস্ট ঃ ১৯৯৭ খ্রীঃ

প্রচ্ছদ ঃ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্, ঢাকা

কিছু জরুরী কথা

তারুয়ায় ছোটদের নিয়ে আলোচনা সভায় বসেছি। হঠাৎ করে মনে হলো সব প্রাণীই তো ছোট থেকে বড় হয়, মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে মানুষের বাহাদুরি কোথায় ? সাথে সাথেই মনে উত্তর জাগলো জ্ঞানে, গুণে ও কর্মে বড় হওয়াই তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ ধারণাই অত্র পুস্তকে রূপ নিয়েছে।

বইটি সবার জন্য লেখা হলেও কিশোর, যুবক, ওয়াকফে নও, তাদের অভিভাবক এবং জামাতের কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষভাবে লিখিত। কেননা, নব জীবন উৎসর্গকারী তথা 'ওয়াকফে নও' স্কিমটি জামাতের খলীফা সাহেব কর্তৃক অতীব গুরুত্বসহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহা প্রতিষ্ঠানিক রূপ ও বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। এই স্কিমের সাফল্যের সাথে ইসলামের গৌরবময় বিশ্ব জয়ের সিংহভাগ নির্ভর করছে। মাতৃগর্ভে জীবনের সঞ্চার হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের বড় হওয়া শুরু হয়। শিশুকালে মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনের আদর-সোহাগে বড় হই। জ্ঞানে, গুণে কর্ম ও ধর্মে বড় হতে হলে অনেক বেশী পরস্পর নির্ভরশীল হতে হয়। এ কথাটি স্মরণ রেখে আমাদের সবাইকে 'ওয়াকফে নও'দের বড় হওয়াতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। বৃদ্ধ বয়সে বইটি লেখার দ্বারা সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষুদ্র প্রয়াসকে আল্লাহ্ কবুল করুন-সবার কাছে এই দোয়া চাই।

আমার বড় ভাই ডাঃ আহমদ আলীর কন্যা আতিয়া আহমদ (প্রফেসর পদে নিয়োজিত) বইটি প্রকাশনা ব্যয় বহন করেছে। আল্লাহ্র দরবারে ওর পরিবারের সবার সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করছি। তা'ছাড়া 'নানা ভাই' সহ এর সাথে যারা যেভাবে জড়িত আছেন তাদের জন্য দরদে দিলে দোয়া করছি। সব শেষে আল্লাহ্র কাছে আকুতি তিনি যেন এ প্রচেষ্টকে গ্রহণ ও ফলপ্রদ করেন। আমীন।

খাকসার
মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
১.৫.৯৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

'আমরা বড় হই, বড় হবো' – রচনাটির বিষয়-বস্তু ছোট ও বড় সকলের জন্যে হলেও তা বিশেষ করে ছোটদের জন্যই। আর এখানেই নিহিত এই রচনার গুরুত্ব। ছোটদের জন্য রচনা তৈরী করা বড়ই কঠিন। ছোটদের মনঃপুত করে, তাদের উপযোগী করে, সহজ-সরল করে কথা বলা মোটেই সহজ নয়। এক্ষেত্রে, এমনই একটি দুরূহ কাজ করেছেন এই পুস্তিকাটির লেখক মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।

জনাব আলী বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা কৃষিবিদ। রাষ্ট্রীয় পদকে ও সম্মাননায় ভূষিত। মাসিক কৃষিকথা-এর সম্পাদক 'কাশ্‌তকার' নামে তিনি এদেশে সুপরিচিত। কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর বহু মূল্যবান রচনা রয়েছে। তাঁর রচনা প্রাঞ্জল, যুক্তিনির্ভর। খোদা-ভীরু ও বিনয়ী এই লেখক কিছুদিন পূর্বেও আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ – এর ন্যাশনাল আমীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পঞ্চাশের দশকে তিনি এই আধ্যাত্মিক জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। এই সুবাদে তিনি ধর্মীয় বিষয়েও লিখেছেন কম নয়। বিষয়-বস্তুর দিক থেকে তাঁর এই রচনাগুলি অবশ্যই অমূল্য। এরই একটি সংযোজন বর্তমান এই রচনা 'আমরা বড় হই, বড় হবো'।

শ্রদ্ধেয় লেখক বড় হয়েছেন জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায়। বড় হয়েছেন বয়সে। এখন তিনি অশীতিপর। এই বুড়ো বয়সেও যে সাধু উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকাখানি তিনি লিখেছেন এবং এজন্য যে কোরবানী তিনি করেছেন তা আমাদের জন্য অনুকরণীয় হোক, এই কামনা করি। প্রার্থনা করি, দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর সর্ব প্রকারের কোরবানী কবুল করুন এবং তাঁকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন ; তাঁর হাফেয ও নাসের হউন। আমীন।

খাকসার

ঢাকা
২৯/৫/৯৭ খ্রীঃ

শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান
সেক্রেটারী, প্রকাশনা বিভাগ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশি বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	সব প্রাণীই বড় হয়	৭
২।	বড় হওয়ার ভালমন্দ	৮
৩।	বড় হওয়ার বীজের খোঁজে	৯
৪।	মেধা বা প্রতিভা ও প্রচেষ্টা	১০
৫।	জীবনে পরিবেশের প্রভাব (ক)	১২
	জীবনে পরিবেশের প্রভাব (খ)	১৫
৬।	স্বাস্থ্য ও সাফল্য	১৭
৭।	কু অভ্যাস ভয়াবহ	২০
	সু অভ্যাস কল্যাণবহ (ক)	
	কু অভ্যাস ভয়াবহ	
	সু অভ্যাস কল্যাণবহ (খ)	২২
৮।	জ্ঞানে বড় হবো (ক)	২৫
	জ্ঞানে বড় হবো (খ)	২৮
৯।	গুণে বড় হবো	৩০
১০।	কর্মে বড় হবো	৩২
১১।	ইসলামের দৃষ্টিতে বড় হওয়া (ক)	৩৫
	ইসলামের দৃষ্টিতে বড় হওয়া (খ)	৩৭
১২।	বড় হওয়ার দায়িত্ব ও প্রস্তুতি	৪৫
১৩।	মানব জীবনের পরিধি	৪৯
১৪।	পরিশিষ্ট	৫১

আমরা বড় হই বড় হবো
সব প্রাণীই বড় হয়

কেউ হয়ত বলতে পারেন আমরা তো সারা জীবন ধরে বড় হই। এতে তো কারো হাত নেই। এনিয়ে লেখালেখির এমন কি আছে ? আশা করি আমাদের লেখায় ক্রমশঃ এর উত্তর পাওয়া যাবে। মাতৃগর্ভে আসার সাথে সাথে প্রত্যেকেরই বড় হওয়া শুরু হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও তা চলতে থাকে। শিশুদের প্রতি মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের আদর সোহাগের সীমা থাকে না। কোন শিশু ইচ্ছা করলেও নিজে শিশু থেকে সারাজীবন এই আদর সোহাগকে ধরে রাখতে পারে না। কখনো পারবে বলে মনে হয় না। আত্মীয়-স্বজনেরাও এরূপ ঘটুক তা চাইবে না। তাই বড় হওয়াটা আমাদের কাম্যও বটে। ক্রমে শিশু বড় হয়ে চলে। সে উপুর হয়, তার দাঁত ওঠে। বসতে, হাঁটতে ও দৌড়াতে শিখে সে। শৈশব পাড়ি দিয়ে হয় সে কিশোর। সাথীদের সাথে খেলাধূলায় ব্যস্ত হয়। দায়দায়িত্ব পালনেরও সূচনা হয়। লেখাপড়ার চাপ বা ঘরসংসারের কাজ করার তাগিদ পড়ে। সময়ে গজানো দাঁত ('দুধ দাঁত বলা হয়) পড়ে যায়, নতুন দাঁত ওঠে। এগুলোও পড়ে, তবে দীর্ঘস্থায়ী হয়। কৈশোরেও সে আটকা থাকে না। যৌবনে পা বাড়ায়। যৌবনের রূপ রস গন্ধ মাধুর্য্য যতই কাম্য ও লোভনীয় হউক না কেন, এখানেও সে স্থায়ী হতে পারে না। বুড়ো হওয়ায় সাড়া না দিয়ে উপায় থাকে না। আবার দাঁত তার মায়া ছেড়ে পড়তে পারে। মাড়ির শূন্যস্থান আর পূরণ হয় না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে-শিশুর বেলায় একের মাঝে চার' (শিশু, কিশোর, যুবক ও বুড়ো) বিরাজ করছে। কিশোরের বেলায় 'একের মাঝে তিন' যুবকের 'একের মাঝে দুই' এবং বুড়োদের বেলায় 'একের মাঝে শুধু একই থাকে।' চুল নখ সাড়া জীবনই বেড়ে চলে। কাট ছাট করে এসবকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। যাদের মাথায় টাক পড়ে তাদের কথা আলাদা। তাদের কথা আমরা ভাবছি না। তাদের কথা তারাই অনেক ভাবে। পুরুষদের দাড়ি গজায়। দাড়িও বেড়ে চলে। চুল দাড়ি পাকে, সাদা হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সবাই বয়সেও বড় হতে থাকে। এসব আমরা চোখে দেখতে পাই, অভিজ্ঞতায় অনুভব করি। তা'ছাড়াও দেহে, মনে, আচার-আচরণে অনেক পরিবর্তন হয়। এসব নিয়ে আলোচনায় যাওয়া লক্ষ্য নয়।

জন্ম মৃত্যুর মত এভাবে বড় হওয়া আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না-সে কথা আগেও বলা হয়েছে। কেউ যদি কোন দায়দায়িত্ব পালন না করে একদম অলস জীবন যাপন করে তবুও সে এ ধরনের বড় হওয়াকে আটকে রাখতে পারে না। এভাবে বড় হওয়া প্রাণীদের জন্যে প্রকৃতির নিশ্চিত বিধান। তা গাছমাছ, পশু পাখী, কীটপতঙ্গের অর্থাৎ ক্ষুদ্র বৃহৎ সারা প্রাণী জগতে

বিরাজমান। বীজ থেকে অংকুর বের হয়, ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে। এসবও বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ বৃক্ষ, পূর্ণ প্রাণী হয়। সংক্ষেপে বলা যায় এক্ষেত্রে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীতে কোন পার্থক্য আছে বলা যায় না। এই বড় হওয়াতে কারো কোন বাহাদুরি নেই। অবশ্যই মানুষের বড় হওয়ার আরো একটি বড় দিক আছে। তা হলো জ্ঞানে গুণে ও কর্মে বড় হওয়া। এভাবে বড় হতে সচেতন সাধনার দরকার হয়। পরবর্তীতে এভাবে বড় হওয়ার বিভিন্ন দিক ও প্রাসংঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হবে।

বড় হওয়ার ভালমন্দ

বলা হয়েছে যে, মানুষ নিজ চেষ্টায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় হতে পারে। অন্যান্য প্রাণীর মাঝে এরূপ দেখা যায় না। তাদের জীবন সাধারণতঃ খাদ্য সংগ্রহ ও বংশ রক্ষাতেই আবদ্ধ থাকে। তাদের জ্ঞান ও কর্মক্ষেত্র খুবই সীমিত। অবশ্য মানুষ তাদেরকে নিজেদের প্রয়োজন মিটাতে নানাভাবে কাজে লাগায়।

মানুষের নিজ চেষ্টায় বড় হওয়ার ভালমন্দ দু'টো দিক আছে। এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া খুবই দরকার। কেননা, কেউ বড় হলেও তার জীবন সার্থক হবে, তার দ্বারা সমাজ উপকৃত হবে তা বলা যায় না। বস্তুতঃ ভালতে বড় হলেই তা হয়। অপর দিকে মন্দতে বড় হলে তার নিজের অমূল্য মানব জীবন ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথে সমাজের জন্যও সে ক্ষতির বড় কারণ হতে পারে। বড় হওয়ার টানে সহজেই কেউ বিপথগামী হতে পারে, হয়ে থাকে। অপরদিকে ভাল হওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলে ভাল হওয়ার আগ্রহ বাড়ে। চেষ্টায় আনন্দ পায়, তৃপ্তি আসে। ভাল বা মন্দ হওয়ার কারণে যারা ইতিহাসকে উজ্জ্বল বা কালিমালিপ্ত করেছে তাদের কিছু উদাহরণ নিলেই আলোচ্য বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে আশা করা যায়। এখানে একটি বিষয় বলে নেয়া খুবই দরকার। ভালর জন্য বড় হতে চাইলে চাই ত্যাগ তিতিক্ষা। মন্দের জন্য বড় হতে চাইলে থাকে ভোগ বিলাস ও শোষণের ডাক বা ক্ষমতার দাপট এসব।

ইতিহাসে ভাল বা মন্দতে বড় হওয়ার অসংখ্য ঘটনা বা উদাহরণ আছে। উভয় ক্ষেত্র হতে কিছু তুলে ধরা হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা সবার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক এবং হযরত মোহাম্মদ (সা) শুধু নিজেরাই সৎ ও ভাল ছিলেন না সমাজের সবাইকে ভাল করতে গিয়ে আপ্রাণ বিরামহীন প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। এজন্য তাঁরা নানাভাবে যুলুম-অত্যাচার ভোগ করেছেন। কিন্তু মানবতার প্রতি দায়িত্ব পালনে কখনও তাঁরা পিছপা হননি। তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুগামীরাও তা-ই করেছেন। অপরদিকে মন্দতে বড় হওয়ার

নজীর রাজা কংশ, নমরূদ, ফেরাউন, হযরত ঈসা (আঃ)-কে যারা শূলে চড়িয়ে ছিল এবং হিজরত করে জন্মস্থান মক্কা ছেড়ে চলে গেলেও যারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে মদিনাতেও শান্তিতে থাকতে দেয়নি যেমন আবুলাহাব, আবুজাহাল ও তাদের দলবল। সাম্প্রতিক ইতিহাসেও পাওয়া যাবে হিটলার ও মুসোলিনিকে। তারা লাখ লাখ লোককে হত্যা করে মানবতার দুশমনরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এদেশের ইতিহাসে আছে মীর জাফর যে নিজের হীন স্বার্থের জন্য দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়েছে বিদেশীদের হাতে। তাতে পরবর্তী প্রজন্মকে পরাধীনতার গ্লানি ভোগ করতে হলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে এদেশেরই কিছু রাজনৈতিক দল দেশের 'স্বাধীনতা' রক্ষার নামে আপ্রাণ অপচেষ্টা চালিয়েছিল। দেশবাসির রক্তে এরা 'হোলি' খেলেছে, এরাও মন্দের জগতে বড় হয়ে শুধু ইতিহাসকেই কলুষিত করেনি, ধর্ম রক্ষার নামে অ-ইসলামিক কর্মকান্ড দ্বারা পবিত্র ইসলামকেও বহির্বিশ্বে দুর্নামের ভাগী করেছে।

বড় হওয়ার বীজের খোঁজে

দৈহিকভাবে বড় হওয়ার মালমশল্লা বা উপাদান আল্লাহ্ই আমাদের শরীরে রেখে দিয়েছেন। অবশ্য এর পুরিপুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় আহারাদি গ্রহণ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি ও নিয়মকানুন মানতে হয়। মানুষের বেলায় ভাল বা মন্দ হওয়ার উপকরণ কোথা হতে আসে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। উত্তরের জন্য দূরে যেতে হবে না। তা-ও মানুষের মাঝেই আছে। আল্লাহ্ মানুষের মাঝে (অন্তরেও বলা যায়) মহত্ব ও হীনত্ব দু'টো প্রবণতাই রোপিত করেছেন। এগুলোকে বুঝার বা চিহ্নিত করার জন্য মানুষেকে বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন। দু'টোর কোন্টাকে সে বিকশিত করবে ও কোনটাকে দমিত বা নিয়ন্ত্রণে রাখবে সে সামর্থ্য এবং স্বাধীনতাও তাকে দেয়া হয়েছে।

মানুষের কুপথে চলার জন্য প্ররোচণা দিতে যেমন রয়েছে শয়তান তেমনি সুপথে ডাকার জন্য আল্লাহ্ যুগে যুগে পাঠিয়েছেন নবী-রসূল। তাঁরা নিজেরা সৎ পথে থেকে সৎভাবে জীবন যাপন করে অন্যদেরকে ঈমান এনে সৎকাজ করতে বলেছেন। তাঁরা ভাল মন্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, চিহ্নিত করেছেন। আচার আচরণ দ্বারা তাঁরা দেখিয়ে গেছেন কিভাবে ব্যক্তি জীবনকে অন্তর্নিহিত হীনত্বের গ্রাস হতে রক্ষা করতে হয়। একই সাথে দেখিয়েছেন কিভাবে নিজের মহত্বের বিকাশে সাফল্য লাভ করা যায়। মহাপুরুষগণ অনুগামীদের সংগঠিত করে জামা'ত সৃষ্টি করেন ও এর মাধ্যমে সমাজ জীবনকে কলুষমুক্ত করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালান। এসব কারণে আল্লাহ্ সৃষ্টির মাঝে মানুষেরই বিচার হওয়ার কথা জানিয়েছেন।

অন্যান্য প্রাণীর মাঝে ভালমন্দের জ্ঞান দেয়া হয়নি। তাদের মাঝে তাদের মধ্য হতে কোন নবী রসূলের আগমনের কথাও বলা হয়নি। তাই ওরা মুক্ত স্বাধীন। ওরা ন্যায় অন্যায় বুঝে না। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উপলব্ধির দাবী রাখে তা হলো মহত্বের জন্য মানুষ যেমন সৃষ্টির সেরা, হীনত্বের প্রভাবে সে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হতে পারে। তাকে সদা ভালমন্দের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। বিবেক বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার দ্বারা এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে মানবতার মুখ উজ্জ্বল করে, তার জীবন সার্থক হয়। কোরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

'নিশ্চয় আমরা মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছি অতঃপর [অসৎ কর্ম করিলে] আমরা তাহাকে হীন হইতে হীনতম স্তরে ফিরাইয়া দিই; সেই সকল লোক ব্যতীত যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে ; অতএব তাহাদের জন্য রহিয়াছে অফুরন্ত প্রতিদান, অতএব, ইহার পর বিচার সম্বন্ধে তোমাকে কিসে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ? আল্লাহ্ কি সকল বিচারকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নহেন ? [৯৫ঃ৫-৯]

নিম্নে উদ্ধৃত কবিতার কয়েকটি লাইনেও তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে ;

'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক
কে বলে তা বহুদূর
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক
মানুষের মাঝে সুরাসুর'।

– শেখ ফজলুল করীম

মেধা বা প্রতিভা ও প্রচেষ্টা

মানুষের বড় হওয়াতে মেধা বা প্রতিভা ও প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। তাই এসব সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সবারই প্রাথমিক ধারণা থাকা খুবই দরকার। মেধা হলো কাজ বুঝবার, ধারণা করার ও স্মরণ রাখার শক্তি। এ শক্তি প্রত্যেকের জন্মগতভাবে পাওয়া স্রষ্টার দেয়া দান। কারো ইচ্ছার উপরে যেমন মেধা নির্ভর করে না, তেমনি তা সবার সমান হয় না। তাই এজন্য কাউকেও হেয় চোখে দেখা উচিত নয়। তবে যার যে মেধা আছে এর সঠিক বিকাশে ইচ্ছাকৃত অবহেলা করলে সে দোষমুক্ত হতে পারে না।

সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী মেধা থাকলে তাকে প্রতিভা বলা যায়। উল্লেখ্য যে, প্রতিভাবানরাও সবাই সমান হয় না। এ-ও স্রষ্টারই বিধান। আরো একটি স্মরণীয় বিষয় হলো যে, মেধা বা প্রতিভা সবারই সর্ব ক্ষেত্রে দেখা যায় না। যেমন একজন বড় কবি হলেই বড় বিজ্ঞানীও হয়ে যাবে তা নয়। দু' একজনের বেলায় এর ব্যতিক্রম হতেও পারে। মেধা বা প্রতিভা যার যতটুকু থাকুক না কেন তা প্রকাশের প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক।

প্রচেষ্টাকে সহজ কথায় বলা যায় নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন তথা জীবনের কর্মসূচী কার্যকর করা। কর্মসূচীর লক্ষ্য হবে শুধু জীবিকা অর্জনেই সীমিত না থেকে বরং বৃহত্তর ও মহত্তর উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে সুন্দর শোভনভাবে গড়ে তোলায় অংশ নেয়া। এ জন্য প্রত্যেকের মাঝে সেবার মনোভাব থাকতে হবে বা গড়ে তুলতে হবে। গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, পরস্পর সহযোগিতাতেই সামাজিক জীবন চালু থাকে ও শক্তিশালী হয়। তাছাড়া সমাজের স্বীকৃতিতেই আমাদের জীবনের সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে। অনেকে বলে থাকেন মেধা বা প্রতিভার দৈন্য প্রচেষ্টার দ্বারা কখনও পূরণ করা যায় না। আবার অনেকে মনে করেন প্রচেষ্টা না থাকলে বা এতে বড় রকমের ত্রুটি থাকলে মেধা বা প্রতিভা পচে নষ্ট হয়, কোনই কাজে লাগে না। এ তর্কের কোন শেষ নেই। তাতে না গিয়ে আমাদের জন্য উপকারের হবে সদা স্মরণ রাখা যে, যত বড় মেধা বা প্রতিভা হয় তা বিকাশের জন্য তত বড় ও ব্যাপক প্রচেষ্টা চাই। আমাদের ব্যবহারিক জীবন হতে কিছু উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। ছোটরা খেলাধূলা খুব ভালবাসে। ধরা যাক কেউ খেলাধূলার ক্ষেত্রে বড় প্রতিভার অধিকারী। তাতেই কি সে নিয়মিত প্র্যাক্‌টিস না করে সোজা অলিম্পিক বিজয়ী হয়ে যাবে ? তা কখনও নয়। এ যাবৎ কারো জীবনে এমনটি ঘটেনি। এরূপ ঘটার আশায় কেউ ঘটা করে অপেক্ষা করলে তার মূল্যবান সময় ও জীবন বৃথা যাবে। পানিতে না নেমেই সাঁতারে কেউ ইংলিশ চ্যানেল পারি দিয়ে রেকর্ড করার কথা কোন সুস্থ লোক কখনও ভাবতে পারে কি ? অন্যান্য ক্ষেত্র হতে দু'একটা উদাহরণ নেয়া যাক। যে সকল কবি সাহিত্যিকি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন, শত শত বছর অতিক্রম করে তাঁরা আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন করে নিচ্ছেন এ জামানাতে যারা নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন, শুধু কি প্রতিভাতে তা হয়েছে ও হচ্ছে ? না, কখনও নয়। সাধনার পরশ দিয়েই তাঁরা প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন। বস্তুতঃ এর কোন বিকল্প নেই। থাকলেও এখনও তা আবিষ্কার হয়নি। যদি কোনদিন এমনটি হয় তবে তা-ও হবে প্রতিভার সাথে প্রচেষ্টা বা সাধনার সহযোগিতায়। ম্যাজিক দ্বারা অচিন্তনীয় অনেক কিছু করা যায়। তা শিখতেও চেষ্টার প্রয়োজন হয়। যদিও ম্যাজিক স্থায়ী হয় না। নবী রসূলগণের কথা ধরা যায়। তাঁরা সবাই অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁদের কেউ কখনও সাধনা ও প্রয়াস হতে বিরত হয়েছেন এরূপ কেউ দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না। তাঁরা আল্লাহ্‌র পথের সন্ধান লাভের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন। সমাজকে ঐ পথের সন্ধান দিতে গিয়ে বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমরা যাতে অনুসরণ-অনুকরণ করি সেজন্যই আল্লাহ্‌ তাঁদের পাঠান। তাঁদের মত আমাদেরকেও মেধা বা প্রতিভার সাথে প্রচেষ্টার সুসমন্বয় ঘটাতে তৎপর থাকতে হবে। তখনই তাদের অনুসরণ আমাদের জন্যে অর্থবহ ও কল্যাণকর হবে।

জীবনে পরিবেশের প্রভাব (ক)

আমাদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশে পরিবেশের অপরিসীম প্রভাব দেখা যায়। তাই পরিবেশ ও এর সাথে আমাদের সম্পর্ক সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করা খুবই জরুরী। পরিবেশ দ্বারা কী বুঝায় সে কথায় আসা যাক। মাতৃগর্ভে থাকাকালে বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যে অবস্থাতে আমরা জীবন কাটাই এর সব কিছু মিলেই আমাদের পরিবেশ। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে সারা বিশ্ব-প্রকৃতিই আমাদের পরিবেশের অঙ্গ। মানুষের নিজের চেষ্টায় যেসব ভাঙ্গাগড়া চলে তা-ও পরিবেশের বাইরে নয়। যদিও এতে পরিবেশে যোগ বিয়োগ ঘটে থাকে। যেমন পাশাপাশি অবস্থিত আমাদের গৃহের অভ্যন্তরে ও বিস্তীর্ণ মাঠের অবস্থা এক থাকে না। একই দেশে অবস্থিত গ্রামগঞ্জ ও শহর বন্দরের বেলাতেও একথা খাঁটে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করতে হচ্ছে। পরিবেশের সবকিছু জানা কারো পক্ষে কখনও সম্ভবপর হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনা ঘটার পরে পরিবেশের বহু রহস্য উপলব্ধি করা যায়। মানুষ তার প্রয়োজনে বহুকাল যাবৎ গাছবৃক্ষ কেটে চলেছে। জঙ্গল কেটে বসতি ও ফল ফসলের আবাদেই মঙ্গল দেখেছে, এতে যে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে আবহাওয়াতে বড় ধরনের প্রতিকূলতা সৃষ্টি হচ্ছে তা বুঝেনি। তিক্ত অভিজ্ঞতায় এখন বুঝতে পেরেছে জঙ্গলেও অফুরন্ত মঙ্গল ছড়িয়ে আছে। এখন সে বনায়নে মনোযোগী হচ্ছে।

কি কি বিষয় আমাদের পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত এর চুলচেরা তালিকা করতে গেলে তা অফুরান হয়ে দাঁড়াবে। আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য বর্তমান অবস্থায় পরিবেশের বিশেষ কয়েকটি দিকে আলোকপাত করা হবে। আশা করা যায় এতেই আমাদের অবস্থা ও এতদ্‌সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব বুঝা সহজতর হবে।

ভৌগলিক অবস্থান ঃ

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বিভিন্ন দেশের এবং একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়াতে বেশ তারতম্য হতে পারে। আবহাওয়া দ্বারা মোটামুটিভাবে বার্ষিক ও মওসুমী বৃষ্টিপাত, ঋতুর পরিবর্তন, তাপমাত্রার ওঠানামা যেমন শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এসবের সামগ্রিক অবস্থা বুঝায়। এসব আমাদের খাওয়া-দাওয়া, বেশভূষায় পরিবর্তন ঘটায়। সবদেশে সব মওসুমে একই জাতের ফসল করা যেমন যায় না তেমনি একই ধরনের পোষাকও পড়া যায় না। নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, দ্বীপ-উপদ্বীপ, মরু, তুষার এসবই আমাদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে। সবারই এসব বিষয়ে কমবেশী অভিজ্ঞতা আছে।

সমাজ ব্যবস্থা ঃ

সব মানুষই সামাজিক জীব। তাই বলে সব মানুষের সমাজ একই ধরনে গড়ে উঠে না। পিঁপড়া মধুমক্ষিকা এসব প্রাণীর মাঝেও যৌথ জীবন আছে। কিন্তু তাতে তেমন কোন পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় না। হাজার হাজার বছর ধরে এদের জীবনধারাও একই ছকে চলছে। বাবুই পাখীর গৃহ নির্মাণেও নির্দিষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মানুষের বেলায় সমাজ ব্যবস্থায় চলছে নিত্য নতুন পরিবর্তনের খেলা। এর যেন শেষ নেই, সীমা নেই। আদি মানুষ বনে জঙ্গলে গুহায় বাস করতো। তারই বংশধরেরা এখন কত রঙ্গের কত ঢঙ্গের ঘরবাড়ী করছে, কত প্রাসাদ, কত উচ্চ দালান বানাচ্ছে তা বলে শেষ করা যাবে না। গুহা- মানবের বংশধরেরা এখন হচ্ছে বিশাল নগরের নাগরিক। যদি সম্ভব হতো কোন গুহামানব এসে এখনকার কোন সর্বাধুনিক বাথরুম বা ড্রইং রুম দেখতো তবে আমরা যে তাদের বংশধর তা-ই হয়ত বিশ্বাস করতো না।

মানুষের সমাজ ব্যবস্থায় জীবন পরিচালনার জন্য নানা প্রকার দিক নির্দেশনা থাকে যা আমাদের জীবনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে। কিছু উদাহরণ নেয়া যাক। যৌন প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমাজ বিবাহ প্রথা চালু করেছে। এতে পারিবারিক ও সমাজ জীবনকে সুন্দর শোভন করে গড়ে তোলা যায়। তাতে রক্ত-সম্পর্ক ও বংশ চিহ্নিত ও প্রসারিত করা হয়। আত্মীয়তার গন্ডী বেড়ে যায়। ভেবে দেখার বিষয় যে, সব সমাজের বিবাহ একরূপ নয়। বিবাহ আমাদের জীবনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে ও দায়িত্বশীল হওয়ার পথ দেখায়। কোন কোন সমাজ মানুষের দীর্ঘদিনের নিজস্ব চেষ্টা ও অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠে। কোন সমাজ বৈষয়িক জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে পরিচালিত হয়। কোন সমাজ আবির্ভূত কোন মহাপুরুষের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষা ও আদর্শকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তবে বর্তমানে প্রায় সব সমাজই বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার মিশ্রণে গড়ে ওঠছে।

বর্তমান জমানায় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি এসবের অতি দ্রুত প্রসার ও পরিবর্তন হচ্ছে। এসবের সাথে তাল রেখে মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটছে। তার ফলফসলাদি উৎপাদনে ঘরবাড়ী, যানবাহন, রাস্তাঘাট নির্মাণে ভাবের আদান প্রদানে কত যে পরিবর্তন চলছে তা বলে শেষ করা যায় না। স্মরণীয় যে-সব পরিবর্তনই কল্যাণের হবে এমনটি বলা যায় না। এমনও দেখা যায় নতুন কোন কিছু আপাত কল্যাণের মনে হয় কিন্তু পরে তা উল্টো রূপ ধারণ করে। কল্যাণ অকল্যাণ চিহ্নিত করার জন্যও বিশেষ গ্রুপ সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ছে।

ধর্ম-প্রধান সমাজ ব্যবস্থা ঃ

দু'চারটি উদাহরণ নিলেই দেখা যাবে ধর্ম মানব জীবনকে কত গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে থাকে। খাদ্য ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। তাই বলে এক ধর্মের অনুমোদিত সব খাদ্য অন্য ধর্মের লোকেরা না-ও খেতে পারে। এমনকি কোন কোন খাদ্যকে ঘৃণার চোখে দেখতে পারে। ইসলাম শূকরের মাংসকে হারাম বলেছে। তাই মুসলমানরা তা খায় না। খৃষ্টানরা তা আনন্দের সাথে খেয়ে থাকে। হিন্দুরা বহু দেবদেবীর পূজা করে, মূর্তি বানায়। মুসলমানেরা কখনও তা করে না। কেননা, একান্তভাবে তারা নিরাকার একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং এটাই সত্য। পূজা ও নামাযের নিয়ম-নীতি এক নয়। ধর্মের নামে হিন্দুদের মাঝে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলে চিহ্নিত বর্ণবৈষম্য শক্ত শিকড় গেড়ে আছে। সামাজিক মর্যাদায় এদের মাঝে মারাত্মক বৈষম্য বিরাজ করে। এতে মানবাধিকার চূড়ান্তভাবে ক্ষুণ্ন হয়। এরূপ ধর্মীয় বর্ণবৈষম্য মানুষের মৌলিক অধিকারকেই চরমভাবে লংঘন করে না, মেধা ও প্রতিভা বিকাশেও মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনকে খাঁটো করে। বৈষয়িক জীবনে আর্থিক 'কোষ্ঠ কাঠিন্য' সৃষ্টি করে। কেননা, জন্মের আগেই কর্মধারা ও কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ স্বভাব চরিত্রে ও আচার আচরণে যত হীন হউক না কেন প্রতিষ্ঠানিকভাবে সমাজে তারা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়। ক্ষত্রিয়রা যোদ্ধা হওয়ার একমাত্র হকদার আর বৈশ্যেরা হবে ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া মালিক মোখ্তার। শুদ্রের জীবন সার্থক (?) করতে হয় অন্যদের পদসেবায়। আবারও তাই বলতে হচ্ছে এরূপ বর্ণবৈষম্য দ্বারা জন্মগতভাবে জীবনের গতিপ্রকৃতিতে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইহা মানবতার প্রতি বড়ই অন্যায়। বর্তমানে হিন্দু সমাজে এসবের ঘোর কেটে ওঠার জন্য তীব্র আন্দোলন চলছে। ধর্মের নামে কিছু কায়েম হয়ে গেলে তা হতে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আমরা কামনা করবো শীঘ্রই এসবের বেড়াজাল ছিন্ন হোক। মানুষের গায়ের রংগে বর্ণের বৈষম্য আছে। এ বৈষম্য স্রষ্টার দান। কোন মানুষকে এজন্য হীন চোখে দেখার অর্থ দাঁড়ায় স্রষ্টার ত্রুটি ধরা ও তাঁকেই হেয় করা এবং নিজের অজ্ঞতা ও হীনমন্যতার পরিচয় দেয়া। যা হোক যে ধরনের বর্ণ বৈষম্যই হোক না কেন এর প্রবল চাপে অনেক সময় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মেধা এবং প্রতিভার অকাল মৃত্যু ঘটে। এতে শুধু ব্যক্তিই নয়, সমাজ এবং মানবতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুনর্জন্ম বিশ্বাস হিন্দুদের তথা বৈদিক ধর্ম অনুসারীদের একটি লৌকিক বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়ের অংশলাভ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। অনেক ধর্মেই তা নেই। এসবই অনুসারীদের চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণে এবং সমাজ ব্যবস্থায় বড় রকমের প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

পরিবেশের প্রভাব (খ)

দারিদ্র ও প্রাচুর্য

দারিদ্র ও প্রাচুর্য দু'টোই আমাদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে থাকে। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে দারিদ্রে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এদের মাঝে আছে ভিক্ষুক, বেকার, টোকাই, গৃহহীন, সহায় সম্বলহীন, ঠিকানাবিহীন মানুষ। এদের প্রবল স্রোত চলেছে গ্রাম হতে হাট বাজারে, চলেছে শহরে-বন্দরে, বাঁচার তাগিদে, জীবিকা অর্জনের সন্ধানে। অনুমানের ভরসায় তাদের এ যাত্রা, নিশ্চিত নয় যে, কোন কাজ-কর্ম মিলবে। তাদের তেমন কোন শিক্ষা দীক্ষা নেই। করিগরি বিদ্যায়ও বলতে গেলে এদের শূন্য হাত। তাদের মধ্যে যারা শহরের বস্তিতে আশ্রয় পায় তাদের কিসমৎ ভাল বলতে হবে। অনেকে তা-ও পায় না। তারা নানাজনের গালমন্দ খেয়ে রাস্তার ফুটপাতে বা গাছের তলায় আশ্রয় নেয়। অনেকে 'নিরাপদে' থাকার জন্য আবর্জনার নোংরা স্তুপের পাশ বেছে নেয়। এসব পরিবেশ মানুষের স্বাস্থ্যই নষ্ট করে না, জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনাকেও পিষে মারে। তারা জ্ঞানে গুণে কর্মে বড় হওয়ার কথা ভাবতে পারে কিনা তাই ভাববার বিষয়। এদের মাঝে যারা অকাল মৃত্যু হতে বেঁচে যায় তারা অকাল বার্ধক্যের গ্রাস এড়াতে পারে বলে মনে হয় না।

আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ 'কাদাল ফাকরু আইঁয়াকুনা কুফরান [সহী বুখারী] অর্থাৎ দারিদ্র মানুষকে কুফরী কার্যকলাপ তথা অন্যায় অমর্যাদাকর, এবং অমানবিক কর্মকান্ডে লিপ্ত করে।

প্রাচুর্য মানুষের জীবন যাপনকে অনেকখানি সহজ করে দেয়। এর সঠিক ব্যবহার জীবনে জ্ঞানে গুণে বড় হতে মানুষের সহায়ক হতে পারে। কিন্তু প্রাচুর্যের অপব্যবহার তার জীবনকে ব্যর্থ করতে ও বিষিয়ে তুলতে পারে। প্রাচুর্য প্রধানতঃ দু'ভাবে এসে থাকে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বা নিজের প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা। প্রথমটি সাধারণতঃ মানুষকে অলস অকর্মণ্য ও বিলাসী করে তোলে। নেশায়ও কেউ অভ্যস্ত হতে পারে। এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। সৎপথে স্বচেষ্টায় প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়াতে যে কৃতিত্ব থাকে তাতেই আটকে পড়ে যাওয়া কাম্য হওয়া উচিত নয়। তাকে আরো এগিয়ে যেতে হবে। তার শ্রমার্জিত কষ্টার্জিত প্রাচুর্যকে সমাজের বৃহত্তর পরিসরে কল্যাণকর কাজে লাগাতে হবে। তাতেই জীবন ও সম্পদ দুটোই সার্থক হয়। দেখা যাচ্ছে প্রাচুর্যই সব নয়। এর সাথে প্রচেষ্টা ও সদিচ্ছার শুভ মিলন চাই। প্রাচুর্য অর্জনে ও এর ব্যবহারে দুর্নীতি থাকলে সমাজে এর দ্বারা অনেক অঘটন ঘটে থাকে। প্রাচুর্যকে শোষণের কাজে লাগালে মুষ্টিমেয় লোক সম্পদশালী হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দারিদ্রের প্রসার ঘটে। অধিক মুনাফা

লাভের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যে হীন পন্থা যেমন-ওজনে ফাঁকি, মজুদদারি, কালো বাজারী, পাচার, জাল, ভেজাল আরো কত জঘণ্য অন্যায় অবিচার যে জীবন্তরূপ ধারণ করে তা বলে শেষ করা যায় না। এভাবে তারা নিজেদের নৈতিক জীবনকে ধ্বংস করে এবং দেশের দশের তথা মানবতার চরম শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। যারা সর্বক্ষেত্রে সুনীতির অনুসরণে সক্রিয় থাকেন তাদের দ্বারা সবাই উপকৃত হয়। অর্থাৎ প্রথম দল দ্বারা সমগ্র পরিবেশ হয় ঘোলাটে আর দ্বিতীয় দল দ্বারা আর্থিক পরিবেশ কল্যাণকর পরিপুষ্টি লাভ করে।

পরিকল্পিত উন্নয়ন ঃ

বর্তমান যামানায় সবদেশেই সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে কমবেশী উন্নয়নের কাজ হয়ে থাকে। সাধারণতঃ দেশের বা এলাকার প্রয়োজন অনুযায়ী পূর্বে অনুমোদিত প্রকল্প মত উন্নয়নের কাজ চলে। এর সাথে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত হতে পারলে দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখা যায়। স্থানীয় অবস্থার সাথে নিবিড় পরিচয় ঘটে। এতে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় ও বাস্তবমুখী জ্ঞান বাড়ে। আজকাল এসব নিয়ে বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক চর্চা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিশেষ বিবেচনা করা দরকার তা হলো শুধু বৈষয়িক উন্নতির উপরেই যেন সব গুরুত্ব সীমিত না থাকে। চরম দারিদ্রে আক্রান্ত দেশে বৈষয়িক উন্নতির প্রাধান্য থাকা স্বাভাবিক। সাথে সাথে নৈতিক মান উন্নয়নে মনোযোগী না হলে দেশে বিরাজিত চরিত্রের দুর্ভিক্ষ কখনও দূর হবে না। সমাজে শান্তি-সোয়াস্তি পুনর্বাসিত হবে না। বস্তুতঃ দারিদ্র এবং প্রাচুর্য বৃহত্তর পরিবেশের প্রধান ও গুরুত্ববহ অঙ্গ।

পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে আরো কিছু কথা বলা প্রয়োজন। পরিবেশের ব্যাপকতা, গুরুত্ব ও প্রভাবের কথা ভেবে অনেকে মনে করেন আমরা পরিবেশের দাস। তাই এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই। অনেকে আবার মনে করেন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং প্রকল্প ও প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষ নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং আদম সন্তানেরা পরিবেশের দাস নয়, 'প্রভু'। তাই তাদের কোন ভাবনা নেই, পরাজয় নেই। অথচ একজন সুস্থ মনের মানুষের এখানেই যত ভাবনা। বস্তুতঃ আমরা পরিবেশের দাস নই, প্রভুতো নই-ই।

আসলে আমরা পরিবেশের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংগ। আল্লাহ্ বিশ্ব প্রকৃতিতে মানুষকে বুদ্ধি ও বিবেকবান এবং ভাঙ্গাগড়ার শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এসব শক্তিকে পরিবেশে কল্যাণকর পরিবর্তন আনতে ও অকল্যাণকর অবস্থা রুখতে বা উৎপাটনে কাজে লাগাতে হবে। সাফল্যের সাথে এসব করতে হলে প্রকৃতি তথা আমাদের পরিবেশে যে 'ভারসাম্য' বিরাজ করছে সে সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখতে হবে। পরিবেশ সম্পর্কে যে যত বেশী জানতে পারবে ভারসাম্য সম্পর্কে

তার ধারণা তত ব্যাপক ও স্পষ্টতর হবে। এজন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি চাই। এ প্রস্তুতির বিশেষ দিকগুলো হলো ধৈর্যের সাথে পরিবেশের মাঝে যে 'ভারসাম্য' বিরাজ করছে তা পর্যবেক্ষণ [বিশেষ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা] ও উপলব্ধি করা। ভারসাম্যে আঘাত লাগলে তাতে কি ধরনের পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা বুঝার জন্য সদা চেষ্টা করা। অভিজ্ঞ লোকদের সাথে পরামর্শ করাকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিকুল প্রতিক্রিয়াকে যথাসম্ভব রোধ করতে হবে। অনুকূল প্রতিক্রিয়াকে ধরে রাখার জন্য যত্নবান থাকতে হবে। যে একটি বিষয়ে সবার সাবধানে থাকতে হবে তা হলো আমাদের প্রস্তুতিকে হীন ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে রাখতে হবে।

ইতিহাসের একটি বড় শিক্ষাকে স্মরণ রাখতে হবে। যখনই অবক্ষয়ের চূড়ান্ত আক্রমণে সমগ্র পরিবেশ অন্যায় অবিচারে, ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে তখনই কোন মহৎ ব্যক্তির শুভাগমন হয়েছে। তিনি তাঁর মহান আদর্শ ও শিক্ষার দ্বারা 'নতুন জগৎ' সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ সুমানুষ দ্বারা সুসমাজ, সুপরিবেশ গড়ে তুলেছেন। এরূপ মহাপুরুষের আদর্শ গ্রহণ করা দ্বারা আমরা প্রকৃতই বড় হতে পারি। সংক্ষেপে বলা যায় নিজে বড় এবং বড়কে অনুসরণ করো।

স্বাস্থ্য ও সাফল্য

কথায় বলে স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। সকল সুখের মূল কিনা তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। তবে স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কোন সুখই যে পুরোপুরি ভোগ করা যায় না তাতে দ্বিমতের কোন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। এতদুপরি সুস্বাস্থ্য যে আমাদের জীবনে সাফল্য আনতে খুবই সহায়ক তা বোধ হয় অস্বীকার করার জো নেই।

শিশু বয়সে আমাদের স্বাস্থ্য দেখাশোনার সব ভার স্বাভাবিকভাবেই মা নিয়ে থাকেন। তাই বলে জীবনভর এভাবে অপরের উপর তা ছেড়ে দেয়া যায় না। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমাগত স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি বুঝতে হবে তা হলো আন্ধাধান্ধাভাবে স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়া যায় না। এজন্য প্রথমেই প্রয়োজন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান বাড়াতে থাকা। এ জ্ঞান কুসংস্কার মুক্ত হওয়া খুবই প্রয়োজন। তাছাড়া লোভ লালসার প্রতি সংযমী অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কাজটি ছোটদের পক্ষে কঠিন, কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয়। কিভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় সংক্ষেপে সে আলোচনা করা যাক। আজকাল পত্রিকাদিতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বেশ আলোচনা দেখা যায়। ওসব হতে অনেক উপকারী বিষয় জানা যায়। রেডিও, টিভিতেও এসব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়ে থাকে। এসব শুনেও অনেক জ্ঞান লাভ করা

যায়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলতে কোন্ কথাটা যে আগে বলবো সে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ নয়। স্বাস্থ্য বিভাগ শিশুদের যে কয়টি টীকা ইন্‌জেকশনের জন্য বয়স নির্দেশ করে যে তাকিদ দেয় ও কর্মসূচী ঘোষণা করে তা পালনে যেন কোন অবহেলা করা না হয়। খাদ্য ছাড়া মানুষসহ কোন প্রাণীই বাঁচতে পারে না। তাই বলে সব খাদ্যই স্বাস্থ্যের জন্য সমভাবে উপকারী তা বলা যায় না। খুব দামী খাদ্য খেতে হবে তা-ও নয়। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পুষ্টিকর ও ভাইটামিন যুক্ত টাটকা শাকশব্জি ফলমূল খেতে হবে। ভাত মাছ এদেশবাসির একটি প্রধান খাদ্য। আটা আলু এসবও আমরা আগের চেয়ে বেশী খাচ্ছি। এটা ভাল কথা। ছোট মাছে পুষ্টি কম থাকে না আর বড় মাছেও তা বেশী থাকে বলা যায় না। মাংস, দুধ ও ডিম-এসব ভাল খাদ্য। ডাল জাতীয় খাদ্যের দ্বারা এসবের অভাব বেশ খানিকটা পুষিয়ে নেয়া যায়। মাড়সহ ভাত রান্নায় (যাকে 'বসানো' ভাত বলা হয়) অনেক বেশী পুষ্টি থাকে। কিছুদিন অভ্যাস করলেই বসানো ভাত রান্না সহজ হয়। প্রত্যহ মাড়ের সাথে অযথা কত পুষ্টি যে আমরা নিজ হাতে ফেলে দিচ্ছি তা ভাবতে অবাক লাগে। এতে আমাদের অজ্ঞতা ও বোকামি দু'টোই প্রকাশ পায়। যথাসম্ভব টাটকা খাদ্য খাওয়া ভাল। বড় বড় শহরে তা পাওয়া দুষ্কর। শাক-সব্‌জি আগে ভাল করে ধুয়ে পরে কুটা বাছাই করা ভাল। কুটা বাছার পর ধৌত করলে পুষ্টির অনেকটা পানির সাথে চলে যায়। আগে ধুয়ে নিলে তা হয় না। আলু সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এর ছাল পুষ্টির উৎস। তাই এর ছাল কেটে নিয়ে রান্না করলে পুষ্টির বড় অংশেরই অপচয় ঘটে। আগে সিদ্ধ করে ছাল ছাড়ালে তা হয় না। সবচেয়ে ভাল হয় সিদ্ধ ছালসহ আলু খাওয়া। একটা কথা শুনে হয়ত অবাক লাগবে যে শুধু ভাল খাদ্যই স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রচুর ভাল এবং দামী খাদ্য খেয়েও স্বাস্থ্য ভাল রাখা যাবে না। যদি খাদ্যের ব্যাপারে কতগুলো সুঅভ্যাস গড়ে তোলা না হয়। গুরুত্ববহ কিছু অভ্যাসের উল্লেখ করা যাক। ভালভাবে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসতে হবে। ধীরে সুস্থে যত বেশী সম্ভব চিবিয়ে খেতে হবে। এতে মুখের লালার সাথে খাদ্যকণার সংযোগ হবে। তা হজমে খুবই সহায়ক হয়। কখনও ভরপেট খেতে নেই। এতে হজমের খুবই ব্যাঘাত ঘটায়। কোর্মা পোলাও পেলে অনেকেই স্বাদ ও আনন্দের প্রাচুর্যে তা বেমালুম ভুলে যায়। ভরপেট খাওয়া অনেক সময়ে পেটের নানা অসুখ ডেকে আনতে পারে।

খাওয়ার ব্যাপারে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপদেশ হলো পেটের $\frac{১}{৩}$ ভাগ খাদ্য দ্বারা $\frac{১}{৩}$ ভাগ পানি এবং বাকী $\frac{১}{৩}$ খালি রাখতে হবে। এ উপদেশটি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ার অভ্যেস করা উচিত। ইহা স্বাস্থ্যের জন্য মঙ্গলজনক। জরুরী অবস্থা ছাড়া এর ব্যতিক্রম করতে নেই।

আমাদের জীবনে পানির গুরুত্ব বলে শেষ করা যায় না। তাই পানির অপর নাম জীবন দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পানি ছাড়া কোন জীবনই বাঁচে না। এ হলো একটি দিক। দূষিত পানিতে বহু মারাত্মক রোগ ছড়ায়। তখন পানি নানা দুর্ভোগ এমনকি অকাল মরণের কারণ হতে পারে। তখন পানি হয়ে দাঁড়ায় জীবন হরণকারী। তাই বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা খুবই জরুরী। শহরে পৌরসভা বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের দায়িত্ব নেয়। গ্রামাঞ্চলে টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার খুবই প্রয়োজন। তা না হলে পানি ফুটিয়ে বা ফিটকারী অথবা পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি দ্বারা বিশুদ্ধ করে ব্যবহার করা উচিত।

আলো বাতাস ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। ঘরবাড়ি বানানোর সময় যথেষ্ট আলো বাতাস পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। আল্লাহ্‌র এসব অফুরন্ত নেয়ামতকে কদর করতে হবে, ঘরে এসবের প্রবেশ নিষেধ করা বোকামির চূড়ান্ত। পরিমিত খেলাধূলা বা ব্যায়াম স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এসব ক্ষেত্রে নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। গাছ-বৃক্ষের উপকারিতা বলে শেষ করা যায় না। গাছ বায়ু শোধন করে, বৃষ্টিপাতে সহায়ক হয়। ছায়া দিয়ে তাপমাত্রা কমায়। গাছ ফুল ফলের বড় উৎস। কাঠ-খড়ি এসবও গাছ হতেই পাওয়া যায়। আমাদের পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গাছ-বৃক্ষের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। একান্ত প্রয়োজন না হলে গাছ কাটতে নেই। একটি গাছ কাটলে অন্ততঃ তিনটি গাছ লাগাতে হবে। যত্ন করে বড় করতে হবে। নতুবা পরিবেশে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে, নিজকে বড় করার পথ সংকুচিত হয়ে যাবে। ছোট বেলা হতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এতে রোগ বালাই কম হয় মনও প্রফুল্ল থাকে। অলস জীবনের চেয়ে কর্মঠ জীবন বড় হওয়ার জন্য অনেক বেশী দরকারী। এজন্য প্রয়োজন মত খেলাধূলা, ব্যায়াম, বাড়ীতে বা মাঠে কাজ করা জীবন বিকাশে খুবই উপকারী। ছাত্রদের পড়ালেখার কাজেও নিয়ম কানুন মেনে চলা উচিত। এ জন্যে সময়মত পড়াশুনা করা, বিশ্রাম নেয়া, ঘুম পাড়া খুবই উপকারী। রাত ১০/১১ টায় ঘুম যাওয়া ও ফজরের আগে বিছানা ছাড়া খুব ভাল। প্রাতঃ ভ্রমণ স্বাস্থ্যের জন্য ভাল মনও ভাল রাখে। আজকাল অনেকেই সান্ধ্য ভ্রমণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সারা বছর অবহেলা করে পরীক্ষার সময়ে খাওয়া, দাওয়া, ঘুম-বিশ্রাম, 'হারাম' করে খালি পড়া আর পড়াতে প্রায়ই দেখা যায় স্বাস্থ্যের ভীষণ ব্যাঘাত ঘটে। এমন কি মানসিক ভারসাম্যেও আঘাত হানতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, যত ছোট বয়স থেকে যতবেশী সুঅভ্যাস গড়ে তোলা যায় ততই আমাদের বড় হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। কেননা, এতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, কর্মশক্তি বাড়ে এবং এসবকে কাজে লাগিয়ে জীবনকে সার্থক করা যায়।

কু-অভ্যাস ভয়াবহ
সু-অভ্যাস কল্যাণবহ (ক)

মানুষের ভালমন্দ কোন অভ্যাসই আপছে গড়ে উঠে না। কেউ কোন কিছু করবে কিনা প্রধানতঃ তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ইচ্ছাশক্তি আমাদের মনে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। বাইরের কোন আকর্ষণ বা নিজের ধ্যান-ধারণার কারণে তা জাগ্রত হয়। ছোটরা কোন কিছু দেখে বা শুনে তা করার ইচ্ছা করতে পারে। সাধারণতঃ তাদের দেখা শুনার কাজটা বড়দের কাছ থেকে হয়ে থাকে। তাছাড়া বড়রা তাদেরকে কিছু দেখতে বা করতে বলতে পারে। তখন বড়দের এই দেখা বা করার ব্যাপারে প্রয়োজনে ভাল মন্দ, উপকারী বা ক্ষতিকর তা বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। শিশুদের প্রশ্নাদি থাকলে তা ধৈর্যের সাথে শুনা ও বুঝিয়ে দেয়া উচিত। ছোটরা খুবই অনুকরণ ও অনুসরণ প্রিয় হয়। এখানেই বয়স্কদের বড় দায়িত্ব এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ছোটদের সঠিকভাবে বড় করে তুলতে হলে বয়স্ক তথা নিকট আত্মীয়দের সদা সতর্ক থাকতে হবে যাতে তাদের কথাবার্তায় আচার আচরণে খারাপ কিছু না থাকে। দেখা যাচ্ছে ছোটদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে ছোট বড় কারো অবদান একক নয়, কম নয়। যে বিষয়টি গুরুত্বসহ বড়দের সদা স্মরণ রাখতে হবে তা হলো ভালমন্দ বুঝবার আগেই বড়দের অনুকরণ অনুসরণে ছোটদের জীবনে ভালমন্দ নানা অভ্যাস দানা বাঁধতে থাকে। বদ অভ্যাসমুক্ত প্রজন্ম পেতে ও কুলষমুক্ত সমাজ গড়তে হলে বয়স্কদেরকেই আগ বেড়ে নিজেদের সব বদ অভ্যাসকে চিহ্নিত করে তা জীবন থেকে চিরবিদায় দিতে হবে। সাথে সাথে তাদেরকে সুঅভ্যাস ক্রমাগত বাড়াতে হবে। মানুষ হিসেবে বড় হওয়ার পথে এর কোনই বিকল্প নেই। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করতে হচ্ছে, তা হলো অপরের ইচ্ছায় জোর করে কোন কিছু (তা ভালই হোক) করাতে গেলে শিশুরা বেঁকে বসতে পারে, তখন আদর সোহাগে ওদের 'সোজা' করতে তথা পথে আনতে হবে। এমন ক্ষেত্রে বয়স্কদের মহবত ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে হতে পারে।

সু বা কু-অভ্যাস যা-ই হোক না কেন, আমাদের অভ্যাসের সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ কাজ নয়। তাই এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস যা আমরা সচরাচর পছন্দ বা অপছন্দ, উপকারী বা ক্ষতিকর বিবেচনা করি ওসব নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। এই পছন্দ বা অপছন্দ, উপকারী বা অপকারী তার সাথে শুধু শিশুটিই নয় পরিবার, পরিজন ও সমাজের ভালমন্দ সংযুক্ত থাকে। শিশুদের অনেককেই নখ চুষতে চায়। স্বাস্থ্যের জন্য তা হানিকর। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ওদেরকে এই অভ্যাস হতে বিরত থাকা শিখাতে হবে। যাদের গলায় তাবিজ দেয়া হয় তারা তা-ও চুষে থাকে। এ অভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য আরো বেশী

ক্ষতিকর। শিশুদের দাঁত মাজায় অভ্যস্ত করতে হবে। দাঁত না মাজা খুব খারাপ। দাঁত মাজলে দাঁতে ময়লা জমে না, মুখে দুর্গন্ধ হয় না। দাঁত দেখতেও ঝকঝকে হয়। ময়লা শুধু দাঁতেরই ক্ষতি করে না নানা রকম পেটের অসুখেরও কারণ হয়ে থাকে। ছোটদের কান্না বা আবদার থামাতে গিয়ে ফাঁকি বা মিথ্যা আশ্বাস দেয়া কখনও উচিত নয়। এরূপ করলে ওরা সহজেই ফাঁকিবাজ বা মিথ্যাবাদী হয়ে যেতে পারে। গালাগালি খুবই নোংরা অভ্যাস। গালির প্রায় সব কথাই থাকে সত্য বর্জিত বা মিথ্যায় আক্রান্ত। ছোট্ট একটি উদাহরণ নিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। রাগ করে কেউ কাউকে শূয়রের বা গাধার বাচ্চা বলে গালি দিল। এগুলো তো পূরাপুরি মিথ্যা। মানুষ কখনও শূয়রের বা গাধার বাচ্চা হতে পারে না। তা ছাড়া যাকে গালি দিচ্ছে তার পিতা হয়ত কোন দোষ করেনি। কেউ কেউ নিজের সন্তানকেও ওভাবে গালি দিয়ে থাকে। গালি সম্বন্ধে কয়েকটি গরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাববার আছে ঃ (১) গালাগালিকে রাগের সন্তান বলা যায়। রাগ ও গালির বাড়াবাড়িতে অনেক ক্ষেত্রে হাতাহাতি, মারামারি হয়ে থাকে। ইদানিং এবিষয়ে আরো অগ্রগতি হয়েছে। বিবদমান পক্ষগুলোর মাঝে 'মরামরি' পর্যন্ত হয়ে যায়। খুন না হলে তো আজকাল খবরের কাগজে 'হেডলাইন' পাবেনা যে ! (২) গালাগালি শিখার জন্য কোন শিক্ষক বা স্কুলের দরকার হয় না। এজন্য ঘরে বাইরে মাঠেঘাটে নিযুক্তিহীন অবৈতনিক শিক্ষকের কোনই অভাব নেই। কথা না বাড়ায়ে বলা যায় বড়রা গালাগালি না ছাড়লে ছোটরা বড় হওয়ার আগেই ওসব রপ্ত করে নিবে, নিচ্ছে। এ জন্য ওদেরকে দোষী করা 'উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়েই' চাপানো হয়। (৩) বাচ্চারা একত্রে খেলাধূলা করে। কখনও ওদের মাঝে গলায় গলা ভাব, পর মুহূর্তেই হতে পারে রাগারাগি মারামারি ছাড়াছাড়ি। এসব ভুলতেও এদের তেমন সময় লাগে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মা বাপ নিজের সন্তানের মুখে অভিযোগ শুনেই অভিযুক্তের এমনকি ওর মা-বাপের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সামান্য বিবাদ বড় হয়ে স্থায়ীরূপ ধারণ করে যা সংশ্লিষ্ট সবার জন্যেই ক্ষতিকর। এরূপ ক্ষেত্রে উচিত হবে বিবদমান বাচ্চাদের একত্রে ডেকে এনে মিল করে দেয়া। দোষীকে দোষ বুঝিয়ে দেয়া আর নির্দোষকে স্নেহ মমতার পরশ দিয়ে সান্ত্বনা দেয়া। তাতে ছোটদের মাঝে ধৈর্য বিকাশেরও সুযোগ পায়। এতে তার গুণে বড় হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। তা না হলে উভয়ের মাঝে ঝগড়াটে অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে, যা কখনও কাম্য নয়। ছোটদের মাঝে দান খয়রাতের অভ্যেস গড়ে তুল্লে হৃদয় প্রশস্ত হয়। অপাত্রে দান সম্পর্কে সতর্ক থাকার গুরুত্ব বুঝাতে হবে। খেলাধূলার ব্যাপারে আরো কিছু বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। খেলোয়ারসুলভ বলিষ্ঠ মানসিকতা যাতে গড়ে ওঠে সেদিকে বড়দের তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে। খেলাতে হারজিত থাকবেই। হারলে নিরাশায় ডুবে যেতে হবে, মোটেও তা নয়। বরং আরো ভাল খেলার প্রস্তুতি নিতে হবে। অপরদিকে জয়ের

আনন্দ যাতে সীমা ছাড়িয়ে না যায় সে জন্যও সজাগ থাকতে হবে। ছোটদের বেলায় অলসতা বাড়ে এবং নেশা ধরে এমনসব খেলায় [তাস, পাশা, দাবা ইত্যাদি] অভ্যস্ত না হওয়াই ভাল। খেলতে হবে, পড়ালেখাও করতে হবে। কোনটা দ্বারা যাতে কোনটা অযথা ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

শুধু পড়ালেখা আর খেলাধূলাই নয় সব কাজই সঠিক সময়ে করতে হবে। আল্লাহ্‌র বিধান পালন করতে গিয়ে মুসলমানেরা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। রোযা রেখে ঠিক সময়ে ইফতার করে, সময় পার হওয়ার আগে আগে সাহরী খেতে হয়। এসবের মাধ্যমে অন্যান্য ফায়দার সাথে সাথে সময়ানুবর্তিতাও শিক্ষা হয়। নামাযে ইমাম তথা নেতার আনুগত্যেও অভ্যস্ত হওয়া যায়। সভা সমিতির মিটিং বা জনসভা ইত্যাদিতে সবারই সঠিক সময়ে অর্থাৎ ঘোষিত সময়ে উপস্থিত হওয়া উচিত। তা না হলে সংশ্লিষ্ট সবাই অযথা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ব্যাপারে এদেশে সাধারণতঃ যা ঘটে তা হতে উদাহরণ নেয়া যাক। ধরা যাক কোন বড় নেতা কর্তৃক আহূত সভায় ১ লাখ লোক জড় হলো ঃ প্রথম ও প্রধান বক্তা ঘন্টাখানেক পরে উপস্থিত হয়ে বল্লেন, আমি আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে সময় নষ্ট করার কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। সময় নষ্ট করার ক্ষমতা কোন সৃষ্ট জীবের নেই। আসলে নষ্ট করছেন শ্রোতাদের অমূল্য জীবন। উপস্থিত শ্রোতাদের প্রত্যেকের জীবনের এক ঘন্টা নষ্ট হলো। কেননা, তা কোন কাজে লাগেনি। এক লাখ লোকের এক লাখ ঘন্টা সময় বৃথা গেল। এ সময় কেউ কখনও ফিরে পাবে না। বেদনাদায়ক হলো যে, একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অবিবেচনা ও দায়িত্বহীনতাই এজন্য দায়ী।

কু-অভ্যাস ভয়াবহ
সু-অভ্যাস কল্যাণবহ (খ)

ধূমপানকে শুধু বদঅভ্যাস বলা বোধ হয় যথেষ্ট নয়। ইহা বোকামিও বটে। ধূমপানে কোন উপকার নেই। চেষ্টা করে এতে অভ্যস্ত হতে হয়। দুনিয়াতে কোটি কোটি লোক ধূমপান না করে কোনই অসুবিধা ভোগ করে না। বরং এতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠলে কোন কারণে ধূমপানের সুযোগ না পেলেই ধূমপায়ী ব্যক্তি অস্থির হয়ে ওঠে, অসোয়াস্তি ও নিরানন্দে সময় কাটায়। ধূমপানের ক্ষতিকর দিক নিয়ে আজকাল নানাভাবে আলোচনা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে নানা সংস্থা গড়ে উঠছে, সামাজিক আন্দোলন চালাচ্ছে। ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গীতে এর ব্যাপক ক্ষতিকর দিক নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলছি। ধূমপানকে নেশাজগতের প্রাইমারী স্কুল বলা যায়। ভাং,

মদ, গাজা ফেনসিডিল, হিরোইন প্রভৃতি ঐ জগতের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়রূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তাই এসব হতে বাঁচার জন্য অনেক বেশী সাবধানে ও সক্রিয় থাকতে হবে। এসবের নেশা মারাত্মক দৈহিক রোগাদির চেয়েও ভয়াবহ।

নেশা জাতীয় ফসলের ব্যবহার প্রধানতঃ দু'ভাবে হয়ে থাকে, যেমন ওষুদ তৈরি ও নেশাখোরদের চাহিদা মিটানোর জন্য। বিশ্বে তামাক, গাজা, আফিম, ভাং ইত্যাদি নেশাজাতীয় ফসলের অধীনে প্রায় ১ কোটি হেক্টর জমি আছে। ওষুদের জন্য এর পাঁচ ভাগের একভাগ জমিই যথেষ্ট। বাকী চার পঞ্চমাংশ জমিতে খাদ্য শস্য চাষ করলে কয়েকটি দেশের খাদ্য চাহিদা মিটানো সম্ভবপর হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। তা'ছাড়া আরো একটি বিষয় বিবেচনার দাবী রাখে, তা'হলো উর্বর জমিতে এসব ফসলের চাষ করতে হয়। এদেশে তামাক চাষের কথা বিবেচনা করলে তা সহজে বুঝা যাবে। এসব নেশাজনক ফসলের দ্বারা শত শত লোক যে নেশাগ্রস্ত হয়ে দিশা হারায়, নিজের ; পারিবারিক ও সমাজ জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে তাই নয়, কোটি কোটি লোকের অনাহার অর্ধাহারের পথকেও প্রশস্ত করছে। সমাজকে নেশামুক্ত করতে পারলে এ অবস্থার আমূল ও কল্যাণময় পরিবর্তন আসবে। শুধু নেশাখোরদেরই নয়, যারা এসব নিয়ে ব্যবসা করছে, কলকারখানা গড়ে তুলছে ও টাকার 'কুমীর' হচ্ছে তাদের মানসিকতায়ও পরিবর্তন আনতে হবে, আনাতে হবে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জেনে শুনে স্বাস্থ্যহানিকর নেশার দিকে মানুষকে প্রলুব্ধ করে [চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনাদি দ্বারা] নিয়ে যাওয়ার মধ্যে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি বা মানবতাবোধের কোনই পরিচয় মিলে না। উল্লেখ্য যে, কোরআনের যে মহান আদর্শ ও শিক্ষার বলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আরবদের জীবন হতে নেশাকে নির্মূল করেছিলেন তাদেরকে প্রকৃত 'বড়' করে গড়ে তুলেছিলেন সে কোরআন দ্বারাই আমাদেরকে তা করতে হবে ; পারতে হবে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এগুলো ষড়রিপু নামে পরিচিত। কেউ কেউ এগুলোকে 'প্রবল' প্রবণতা আবার কেউ কেউ বলে মানুষের শক্তি বা 'ক্যাপাসিটি'। রুশো বলেছেন, 'বিবেক হলো আত্মার স্বর আর রিপু হলো দেহের ভাষা'। যেভাবেই আমরা এগুলোকে গ্রহণ করি না কেন এগুলো সম্পর্কে খুব সাবধান থাকতে হবে। প্রত্যেকটির সাথে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। অভিধানে কামের যত অর্থই থাক না কেন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো যৌন সম্ভোগেচ্ছা। এর সাথে বংশ রক্ষা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। যাকে কখনও অবহেলা করা যায় না। ইহাকে শুধু ভোগ বিলাসের উপাদান হিসেবে গ্রহণ না করে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে সুন্দর শোভন ও কলুষমুক্তভাবে গড়ে তোলার কাজে লাগাতে হবে।

এজন্য ধর্মীয় ও কল্যাণকর সামাজিক বিধিবিধান মতে এসব ব্যবহার করতে হবে। যৌন জীবনে সংযমকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ক্রোধ দ্বারা রাগ, রোষ, গোস্বা বুঝায়। এর ব্যবহারেও সাবধান থাকতে হবে। অযথা ব্যবহারে এর দ্বারা যেমন ক্ষতি হয়ে থাকে তেমনি প্রয়োজনে ব্যবহার না করাও ক্ষতির কারণ হতে পারে। লোভ হলো কাম্যবস্তু পাবার প্রবল বাসনা। লোভের বশে পরের দ্রব্য আত্মসাৎ প্রবৃত্তিও জাগ্রত হতে পারে। অপরদিকে ভাল কোন কিছু করার লোভ দোষের হতে পারে না। মোহের অর্থ হলো অজ্ঞতা, অজ্ঞান, মূর্খতা, মূঢ়তা ইত্যাদি। এসবকে জীবনে স্থান দেয়া যায় না। এসবকে দূরে রাখতে হবে, এসব হতে দূরে থাকতে হবে। মদ দ্বারা দম্ভ, গর্ব অহংকার ও প্রমত্তকর রস বুঝায়। এসম্পর্কেও বিশেষ সাবধান থাকতে হবে। 'প্রমত্তকর' রস তথা নেশা নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। মাৎসর্যের ক্ষেত্র হলো ঈর্ষা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা। এগুলো খুবই ক্ষতিকর। এগুলো দ্বারা আক্রান্ত না হওয়ার জন্য সাবধান থাকতে হবে। তা'ছাড়া পরনিন্দা, পরচর্চা হতেও দূরে থাকতে হবে। কেননা, এসব দ্বারা সামাজিক পরিবেশ ক্ষুণ্ন হয়। যারা এসব করে তারা নিজেদের বড় করে তুলতে পারে না। অমূল্য মানব জীবনকে সার্থক করে গড়ে তুলতে হলে আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্মশুদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, সর্বক্ষণের সাথী করতে হবে। অভ্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে সু ও কু-অভ্যাসের চর্চা অনেক ক্ষেত্রেই পাশাপাশি করা আবশ্যক। কেননা, কোন কোন ক্ষেত্রে একটির বিদায়ে অপরটি আপছেই হাজির হয়। যেমন অলস জীবন ছেড়ে দেয়ার অর্থই হলো সক্রিয় জীবনে প্রবেশ। বাড়াবাড়িতে সীমালঙ্ঘন করলে সু-অভ্যাসও ক্ষতিকর রূপ নিতে পারে। যেমন পরীক্ষার সময়ে রাতভর জেগে পড়া-লেখা করা। এতে স্বাস্থ্য ও স্মরণ শক্তির উপর বড় রকমের আঘাত হানতে পারে। সুতরাং বাড়াবাড়ি হতে সু-অভ্যাসকে রক্ষা করতে হবে। 'মুদ্রাদোষ' নামক অভ্যাসটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ হলো অপ্রয়োজনে এক বা একাধিক শব্দ উচ্চারণ বা কোন বিশেষ অঙ্গভঙ্গি করা। যেমন 'তবে কিনা, আর কি বলবো' ইত্যাদি। বিশেষ করে বক্তাদের বেলায় এসব খুবই বেমানান দেখায়। এজন্যেই বোধ হয় শব্দটির মাঝেই 'দোষের' সংযোগ দেখা যায়। সচেতন চেষ্টায় তা দূর করা যায়। মনের দৃঢ়তার দ্বারা যেকোন বদঅভ্যাস হতে মুক্ত হওয়া যায়। একবার মুক্ত হলে অনাবিল আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়। সমাজেও মান সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বাড়ে। অভ্যাসের ব্যাপারে আমাদের শ্লোগান হউক ঃ

কু-অভ্যাস ছাড়,
সু-অভ্যাস ধর।
কু-অভ্যাসে ক্ষতি ভাই
সু-অভ্যাসে মঙ্গল পাই।

জ্ঞানে বড় হবো (ক)

পরবর্তী আলোচনা বুঝতে সহজতর করার জন্য কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ শব্দ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এখানে তা-ই করা হচ্ছে ঃ

চিন্তা–ধ্যান, অনুধাবন বা মনে মনে আলোচনা করা, একাগ্রমনে উপলব্ধি করা।

পর্যবেক্ষণ–অভিনিবেশ সহকারে দর্শন, মনোযোগের সহিত লক্ষ্যকরণ।

জ্ঞান–অবগতি, জানা, বুঝিবার শক্তি, চেতন, শিক্ষা।

বিজ্ঞান–বিশেষ জ্ঞান, পরীক্ষা প্রমাণ প্রভৃতি দ্বারা নিরূপিত শৃংখলাবদ্ধ জ্ঞান, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে কোন বিষয়ে ক্রম অনুসারে লব্ধ জ্ঞান।

প্রযুক্তি–প্রয়োগ করার [কাজে লাগাবার] কৌশল, প্রকৃষ্ট যুক্তি [উত্তম বা উৎকৃষ্ট যুক্তি]।

বিদ্যা–অধ্যয়ন, অনুশীলন [পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বা চেষ্টা] প্রভৃতি দ্বারা লব্ধ জ্ঞান।

শিক্ষা–অভ্যাস, চর্চা প্রভৃতি দ্বারা আয়ত্তকরণ।

শিক্ষণ–অধ্যয়ন, বিদ্যার্জন, চরিত্রোন্নতি।

পর্যালোচনা–সম্যক আলোচনা, অনুশীলন বা বিচার।

মূল্যায়ন–মূল্য নিরূপণ, গুরুত্ব উপলব্ধি।

জ্ঞানের আভিধানিক অর্থ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। সহজ সরল ভাষায় কোন বিষয় সম্পর্কে কিছু জানাকেই জ্ঞান বলা যায়। জ্ঞানের কোন সীমা পরিসীমা নেই। এর প্রকারভেদেরও শেষ নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রকৃতির বহু অজানা রহস্যকে বাস্তব জীবনে অহরহ কাজে লাগানো হচ্ছে। তা ছাড়া নানাভাবে মানুষের চিন্তা চেতনাও ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করতে হচ্ছে যা মানুষের অগ্রগতিতে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে চলেছে। তা হলো মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। এর বলে বিজ্ঞানীরা যেমন প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যকে আয়ত্ব করছেন তেমনি জনগণের মাঝেও অনেকেই গবেষণাগার ছাড়াই অগণন তাৎপর্যবহ অবদান রাখছেন এবং তা সবদেশেই হচ্ছে। এদেশের কিছু উদাহরণ নিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। যেমন খাদ্যদ্রব্যের শত শত রকমের রান্না ও পিঠা তৈরি, তেমনি কাঁথা শিলাইয়ের কথাও বলা যেতে পারে। মাটির তৈরি দ্রব্যাদিও উল্লেখের দাবি রাখে।

জ্ঞানের বড় দু'টো দিক হলো এর ব্যাপকতা ও গভীরতা। ব্যাপকতা হলো যত বেশী বিষয় সম্পর্কে এবং গভীরতা হলো একই বিষয়ে যথাসম্ভব বেশী করে জানা। এর ফলে অনেকেই কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশারদের মর্যাদা লাভ করে থাকেন। এ যামানাতে কোন বিষয়ে বিশারদ হওয়া বড় হওয়ার বড় ক্ষেত্র।

জ্ঞানের পথে আমাদের যাত্রা মাতৃগর্ভ হতে শুরু হয় কিনা তা আমার জানা নেই। তবে পৃথিবীতে পা রাখার সাথে সাথে মানুষের জ্ঞান আহরণ শুরু হয় তা বোধ হয় নির্দ্বিধায় বলা চলে এবং তা জীবনভর চলতে থাকে। তাই প্রবাদে আছে 'দোলনা থেকে কবরে যাত্রা অবধি' তা চলে [From Cradle to Grave]। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বাচ্চার হাসি-কান্না, মা-বাপ ও নিকট আত্মীয়-স্বজনকে চিনা এসব তার পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান আহরণের প্রাথমিক স্তর।

যেসব শক্তি-সামর্থ্য, উপাদান-উপকরণ ক্রমাগত মানুষের জ্ঞানের পরিধিকে সম্প্রসারিত করছে এর প্রধানগুলো ঃ (১) পঞ্চইন্দ্রিয় (২) চিন্তন (৩) পর্যবেক্ষণ (৪) ব্যাপক গবেষণা ও প্রযুক্তির প্রসার (৫) ভাবের আদান প্রদানকে যান্ত্রিকায়ণ এবং (৬) লেখাপড়া তথা বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থাদি। (৬) নম্বরটি নিয়ে আলাদা আলোচনা করা হবে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এসব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের অন্তর জগতের সাথে বহির্জগতের সংযোগ ঘটে। তাতে বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মিতে থাকে যাকে বলা যায় জ্ঞান লাভ করা। বহির্জগৎ বড়ই বৃহৎ ও বৈচিত্রময়। এর সব কিছু খালি চোখে কেন, অনুবীক্ষণ দুর্বীক্ষণ যন্ত্রাদি দ্বারাও দেখা সম্ভবপর নয়। যদিও যন্ত্রাদির উৎকর্ষ দ্বারা আমাদের দেখার দিগন্ত সদা প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের অভ্যন্তরীণ জগতও কম বৈচিত্রের অধিকারী নয়। আমাদের জীব-কোষ যা শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না এর রহস্যেরও অন্ত নেই। তবে যত অভিনিবেশে চিন্তা করবো ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার যত বাড়ানো অর্থাৎ আমরা যত সক্রিয় জীবন যাপন করবো আমাদের জ্ঞানের পরিধিও ততই বাড়তে থাকবে। এসব কারণে এগুলোকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বলা হয়ে থাকে। অবশ্য মনের সংযোগ ছাড়া এগুলো কার্যকর হয় না। এজন্যই বলা হয় 'মনোযোগ' দিয়ে শুন বা পড় ইত্যাদি। জীবন ধারণের বাস্তবতায় এগুলোর গুরুত্ব ও কার্যকারিতা অপরিসীম। এসবের হেফাযতের জন্যও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

(২) যার চিন্তন ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা যতবেশী ও তোখড় সে যদি এসব সাধ্যমত কাজে লাগায় তবে তার বড় হওয়ার পথ তত ব্যাপক ও সুগম হয়। বস্তুত: মানুষের গবেষণার প্রেরণা প্রতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করার আগে এ দু'টো গুণই তাকে অনেক পথ এগিয়ে নিয়েছে, এখনও নিচ্ছে। এ শক্তিদ্বয় মানুষকে প্রাণী জগতে অতুলনীয় করে রেখেছে। (৩) ব্যাপক গবেষণায় প্রকৃতির নিত্য

নতুন রহস্য আমাদের হাতে ধরা দিচ্ছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে এসব রহস্যকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগানো হচ্ছে। ফুলফল ফসল উৎপাদনে এসবকে আমাদের নিত্য দিনের সাথী করে নেয়া হচ্ছে। খাওয়া খাদ্যেও নতুন নতুন মজাদার আইটেম যোগ হচ্ছে। গৃহ নির্মাণেও অনেক পথ অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছি আমরা। যাতায়াতে কত ধরনের যানবাহন জলে স্থলে আকাশে সেবা দিচ্ছে তা বলে শেষ করা যাবে না। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মোটেও মানুষ স্থবির নয় বরং অচিন্তনীয় অগ্রগতি লাভ করে চলেছে। আদম সন্তানেরা আরো আরো এগিয়ে যেতে চায়। যারা চায় বড় হতে তাদেরকে এসব ক্ষেত্রেও বিশারদ হতে হবে। স্বল্প কথায় এখানে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রের ইংগিত দেয়া ও উল্লেখ করা হলো। এ যামানাতেই আমরা বাস করছি। তাই ইংগিতই আমাদের জন্য যথেষ্ট বিবেচনা করি। ছোট বেলা থেকে যার যে বিষয় শিখতে আকর্ষণ বেশী সে যদি ঐ লাইন বেছে নেয় তবে তার পক্ষে ঐ ক্ষেত্রে জ্ঞানে বড় হওয়া সহজতর হয়।

(৪) আমাদের জ্ঞানের প্রসারে ভাবের আদান–প্রদানকে যান্ত্রিকায়ণ দ্বারা অচিন্তনীয় অবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এসব ক্ষেত্রে পারদর্শী হওয়া খুবই প্রয়োজন। এখানে ৩টি বিষয়ের উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি। যেমন (ক) বিভিন্ন রকমের পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ও হচ্ছে–এক কথায় বলতে গেলে দু'এক শতাব্দী আগেও তা ছিল অভাবিত। (খ) রেডিওর আবির্ভাব ভাবের আদান-প্রদান ও জ্ঞানের প্রসারে অকল্পনীয় অবদান রেখে চলেছে। (গ) টিভি বলতে গেলে বিশ্বকে আমাদের গৃহকোণে নিয়ে এসেছে। ডিশ এন্টিনা একে অনেক ব্যাপক ও কার্যকর করে তুলেছে। তাছাড়া ফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট এসবের অবদানকে হেলা করা যায় না। এসবই শেষ নয়। প্রকৃতির আরো অগণন রহস্য ধরা দেয়ার জন্য অপেক্ষায় আছে। ওসব আবিষ্কারে 'তৃতীয় বিশ্বকে' প্রত্যক্ষ ও প্রভূত অবদান রাখতে এগিয়ে আসতে হবে। মৌলিক আবিষ্কারে স্থান করে নিতে হবে। তবেই আমরা আরো বড় হবো। একটি বিষয় উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যে কোন টেকনিক্যাল লাইনে যোগ্যতা অর্জন বেকারত্ব সমাধানে অর্থাৎ জীবিকা অর্জনে অনেক সহায়ক হতে পারে।

প্রযুক্তিতে আমাদের পরনির্ভরশীলতা দূর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এর একমাত্র পথ হলো মৌলিক আবিষ্কারে অবদান রাখা। অন্যেরা আবিষ্কার করে আমাদের হাতে তুলে দিবে–এ রুগ্ন মানসিকতার অবসান অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য যে, প্রতিভার জন্ম দেয়া কোন দেশের জন্য আল্লাহ্ একচেটিয়া করে দেননি। নোবেল বিজয়ী প্রথম মুসলমান বৈজ্ঞানিক প্রফেসর আব্দুস সালাম [মরহুম] এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অবশ্য কোন দেশের পরিবেশ প্রতিভা

বিকাশে প্রতিকুল হতে পারে। প্রতিকুলতা অতিক্রম করাও প্রতিভারই কাজ। জ্ঞান সম্পর্কে ৩টি উদ্ধৃতি দিয়ে এই আলোচনার ইতি টানছি ঃ

'তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর যদি সুদূর চীন দেশেও যেতে হয়।'–হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

'ধন দৌলতকে মানুষের পাহারা দিতে হয়, কিন্তু জ্ঞান নিজেই মানুষকে হেফাযত করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।' – হযরত আলী (রাঃ)

'যে কোন জিনিস বেশী হয়ে গেলে তার মূল্য হ্রাস পায় কিন্তু জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পায়, তার মূল্য ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে।' – ইবনে সীনা

জ্ঞানে বড় হবো (খ)

জ্ঞান পিপাসা মানুষের মজ্জাগত। এ পিপাসা মিটাবার জন্য সে বহু উপায় উপকরণ আবিষ্কার করেছে, ওসবের সাহায্য সহায়তা নিচ্ছে। অতি আদিতে সে হয়ত নিজের চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপরেই নির্ভর করতো। ক্রমশঃ সে উপলব্ধি করলো যে, তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধি-বিবেচনা বেশী রাখে তাদের কাছে যেতে হবে, তাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার কথা শুনতে হবে। স্মরণ রেখে ওসব কাজে লাগাতে হবে। এভাবেই হয়ত সমাজে শিক্ষা বা বিদ্যা অর্জনের প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে তোলার বীজ রোপিত হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে বর্তমান যামানায় এসে আদম সন্তানেরা বিভিন্ন দেশে হাজারো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, আরো তুলবে। বর্তমানে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, প্রত্যেক দেশের সরকারের একটি মৌল দায়িত্ব হলো সকল নাগরিকের জন্য ন্যূনতম শিক্ষার [এদেশে প্রাইমারী স্তর] সুযোগ সৃষ্টি ও তা বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগও কম নয়। এসবের লক্ষ্য হলো জনগণকে মানবসম্পদে পরিণত করা। অর্থাৎ দেশবাসিকে যথাসম্ভব কার্যকর জ্ঞানে বড় করা। প্রসংগতঃ বলা যায় কোরআন জ্ঞান অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কোরআনে জ্ঞানকে তিন ভাগে ভাগ করেছে ঃ (১) 'ইলমুল একীন' – যুক্তি ভিত্তিক জ্ঞান। কোথাও ধূম্র দেখলে সেখানে আগুন আছে বিশ্বাস করা। কোন মধ্যবর্তীর সাহায্যে জ্ঞান লাভ। (২) 'আইনুল একীন' প্রত্যক্ষ জ্ঞান। আগুন আছে চোখে দেখা। (৩) 'হাক্কুল একীন' আগুনের কাছে গিয়ে এর দাহিকা শক্তির অভিজ্ঞান লাভ করা অর্থাৎ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক জ্ঞান। জ্ঞানে বড় হওয়ার শুভ যাত্রায় লেখা তথা অক্ষরের দান বোধ হয় সর্বাধিক। স্থান-কাল পাড়ি দিতে গিয়ে মুখের অনেক কথাই হারিয়ে যায়, বহু কথার রূপ বদলায়, অন্যদের যোগ-বিয়োগ মূল ভাবের ওলট-পালট ঘটায়। কোন কথা স্থায়ী হলেও যার কথা তার নাম যায় হারিয়ে। একের কথা হয়ত অন্যের নামে হয় প্রতিষ্ঠিত। এসবকে

কাটিয়ে ওঠার জন্যে আদম সন্তানেরা বহু সাধনায় রত রয়েছে। অবশেষে সে সফলকাম হলো, অক্ষর বা লেখা আবিষ্কার করলো। এর বলে সে নিজের ভাবকে লেখার মাধ্যমে বন্দি করার ফন্দি খুঁজে পেলো। তাতে উল্লেখিত অসুবিধাসমূহ দূর হওয়ার সাথে সাথে আরো বহু সুবিধা সৃষ্টি হলো।

লেখার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-ভাবনা চাক্ষুষ রূপ ধারণ করে। চিন্তা শক্তির ব্যাপকতা মানুষের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও তা মানুষের মনোজগতের ব্যাপার। মনকে যেমন দেখা যায় না তেমনি চিন্তাও আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। একের চিন্তা অন্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। কথার মাধ্যমে অন্যের চিন্তা কানে শুনা যায়, কখনও চোখে দেখা যায় না। কিন্তু লেখার মাধ্যমে তা দেখা যায়। তাই লেখাকে বলা যায় মানব চিন্তার চাক্ষুষ রূপ। তা'ছাড়া লেখার মাধ্যমে হাত মুখের কাজ এবং চোখ কানের কাজ করে থাকে বলা যায়। বই পুস্তকাদি লেখার মাধ্যমে হাজার হাজার অজানা ও অনুপস্থিত লোকের কাছে নিজের চিন্তা ভাবনাকে তুলে ধরা যায়। শত শত বৎসর পরের প্রজন্মের কাছেও তা পৌছানো যায়। স্থান কালের বাধাও অতিক্রম করা যায়। গীতা, বাইবেল কোরআন, প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থাদি ছাড়াও অনেক কবি সাহিত্যিক দার্শনিক বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, আইনবিদ, ঐতিহাসিকদের কালজয়ী গ্রন্থাদির বেলায়ও একথা খাটে। অর্থাৎ কলম মানুষের বড় হওয়ার পথকে ক্রমাগত প্রশস্ত করে চলেছে। লিখতে গিয়ে লেখককে অনেক চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। তখন লেখক নিজেই নিজের শিক্ষক হয়ে দাঁড়ায়।

বড় হতে হলে আমাদেরকে সাধারণ বা পেশাগত কোন শিক্ষাকেই অবহেলা করলে চলবে না। বরং এসবের কোন শাখা বা প্রশাখায় পারদর্শী হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মনে রাখতে হবে এ যুগ পারদর্শিতার যুগ। প্রয়োজনে বিদেশে গিয়েও শিক্ষা লাভ করতে হবে। স্বল্প কথায় বলা যায় জ্ঞান অর্জন বা বিদ্যা লাভের ক্ষেত্র এক অসীম মহাসাগর। এ হতে যে যত মণি মুক্তো কুড়োবে সে-ই তত বড় হবে। অবশ্যই সে জ্ঞান নিজের দেশের-দশের কলাণে লাগাতে হবে। নতুবা শেখ সাদীর ভাষায় 'তুমি যা শিখলে তা যদি অন্যকে শিখাতে না পার তবে তুমি মস্ত বোকা।'

জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি এসবকে অবহেলা করে কোন ব্যক্তি বা জাতির বড় হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে বলে মনে হয় না। বরং এসবের দ্রুত অগ্রগতির সাথে সাথে বৈষয়িক উন্নতির শত শত শাখা প্রশাখা বিস্তার লাভ করছে। কৃষি, চিকিৎসা, প্রকৌশল, আইন, সাংবাদিকতা, বেতার, টিভি এসব পরিচিত ক্ষেত্রগুলোও স্থবির নয়। খনিজ জগৎ, সাগর, মহাসাগর, মহাকাশ এসব ক্ষেত্রও প্রজন্মের সামনে অচিন্তনীয় সুযোগ সুবিধা ও সৌভাগ্যের আহ্বান জানাচ্ছে যে, যে ক্ষেত্রেই যাক

না কেন নিষ্ঠার সাথে সাধনা দ্বারা তাতে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও কল্যাণকর বৈচিত্র সৃষ্টিতে পেছনে থাকলে সমন্বয় থাকবে না। শত চেষ্টায় যদি কোন একটা পা-কে কিঞ্চিৎ লম্বা করা যায় তবে এ বৃদ্ধিতে যতই 'বাহাদুরি' থাক না কেন; খুঁড়িয়েই হাঁটতে হবে। তা'ছাড়া বৈষয়িক অগ্রগতিতে নৈতিকতার পুণ্য পরশ না থাকলে তা মানবতার জন্য আরো ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোরআন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দোয়া শিক্ষা দিয়েছে। এর বাংলা তর্জমা হলো ঃ 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে ইহকালে কল্যাণ এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর, এবং আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর।' বস্তুতঃ এতে ইহ ও পরকালের সুন্দর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। যে আগুনের কথা বলা হয়েছে তা পরকালের দোযখের শাস্তিতেই সীমিত নয়, ইহকালের দুঃখ, দৈন্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অবক্ষয় ইত্যাদিকেও বুঝানো হয়েছে।

গুণে বড় হবো

ইতিমধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বড় হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এসবের সাথে সাথে গুণে বড় হওয়া অত্যাবশ্যক। নতুবা মানব জীবনের সার্থকতায় সমন্বয়ের বাঁধনে ছেদ দেখা দিবে। তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তির প্রাচুর্য সত্ত্বেও মানবতাবোধে ভাটা পড়বে। গুণ দ্বারা কি বুঝায় সে ধারণা যত স্পষ্ট ও ব্যাপক হবে জীবনের সার্থকতায় ততই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজতর হবে। গুণের আভিধানিক অর্থ হলো ঃ ধর্ম, স্বভাব, প্রকৃতি, দক্ষতা, নৈপুণ্য, যোগ্যতা, ফলদায়ক, ক্ষমতা, সুফলপ্রদ শক্তি। তাছাড়া চরিত্রের যে উৎকর্ষের জন্য আদরনীয় বলে গণ্য হওয়া যায় এসবই মানব জনম সার্থক করার জন্য গভীর তাৎপর্য বহন করে। যে মানুষ নিজের জীবনে জ্ঞান ও গুণের সুষ্ঠু ও কার্যকর সমন্বয় ঘটাতে পারে তার জন্য মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ অনেকটা সুগম হয়ে আসে।

প্রত্যেক প্রাণীর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত জীবন আছে যেমন মানুষের মনুষ্যত্ব, পশুর পশুত্ব, বৃক্ষের বৃক্ষত্ব ইত্যাদি। এসবের পরিপূর্ণ বিকাশই তাদের জীবনে সার্থকতা আনে। এ বিষয়ে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মাঝে যে পার্থক্য দেখা যায় তা খুবই গুরুত্ববহ এবং তাতে অনেক দিক-নির্দেশনার সন্ধান মিলে। পশুর পশুত্ব, বৃক্ষের বৃক্ষত্ব এসবের বিকাশে নিজেদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত একক বা সমষ্টিগত তেমন কোন অবদান থাকে বলে মনে হয় না। অপরদিকে মনুষ্যত্ব বিকাশে মানুষের নিজস্ব ও অন্যান্য তথা সমাজের অবদান অপরিসীম। মানুষের সাধ্য-সাধনার সাথে আদর্শেরও সংযোগ থাকে। তা না হলে মানুষ বিপথগামী হয়ে নিজের

মনুষ্যত্বকে পিষে মারতে পারে এমনকি সমাজকে বিপদগামী করতে, দেশ এবং জাতিকেও অবক্ষয়ের পংকিলতায় ডুবিয়ে দিতে পারে। এক কথায় কোরআনের ভাষায় 'নীচাদপি নীচ' (সূরা ত্বীন) হয়ে পড়তে পারে। দেখা যাচ্ছে মানুষের মাঝে ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যাকে গ্রহণ বর্জনের বিরাট কল্যাণময় বা অকল্যাণের ধ্বংসকর সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

স্মরণীয় যে, জ্ঞানবান ব্যক্তি যদি গুণবান না হয় তবে তার শিক্ষা–দীক্ষাও বৃথা যায়, সমাজের জন্যও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই সে সমাজে অনাদৃত এমন কি ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমাদের উচিত ছোট বেলা হতেই জ্ঞানে 'বড়' হওয়ার সাথে সাথে গুণে 'বড়' হতে সক্রিয় থাকা। উল্লেখ্য যে, জ্ঞানের ন্যায় গুণের ক্ষেত্রটিও ব্যাপকতা ও উৎকর্ষের দিক দিয়ে সীমাহীন। এসব ক্ষেত্রে যখনই মনে করবেন শেষ সীমায় পৌঁছেছি সেখানেই মহা ভুল করা হবে এবং মানবতার চরম শত্রু অহংকারের গ্রাসে পড়তে হবে। বস্তুতঃ 'অহংকারই পতনের মূল'। কখনও পুরাণো হবার বা পূরা না হবার নয়।

কিছু উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা যাক। মানুষকে ভালবাসা খুবই মহৎ গুণ। দেখা যায় কেউ তার এই ভালবাসা প্রতিবেশী বা এলাকাতে সীমাবদ্ধ রাখে। কেউ নিজের দেশবাসি বা স্বধর্মাবলম্বীদের মাঝে তা ছড়িয়ে দিতে ব্যস্ত, কেউ আরো এগিয়ে যেতে তৎপর। তিনি উল্লেখিত সব সীমা অতিক্রম করে বিশ্ববাসিকে ভালবাসেন, কেউ সমগ্র সৃষ্টির প্রতি গভীর মমত্ববোধ অনুভব করেন। কারো ভালবাসা শাদা বা কাল রংগের মানুষে আবদ্ধ হয়ে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে, তেমনি কারো থাকে উচ্চ বা নিম্ন বর্ণে তথা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এ সবে বিভক্তি।

মানুষকে গুণের ভিত্তিতে প্রধানতঃ ভাল, মন্দ ও কপট এ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। গুণের অধিকারী হওয়ার জন্য আমাদেরকে কতকগুলো বিষয় সদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। কোন গুণকে নিজের জীবনে সঠিকভাবে কার্যকর করতে হলে পরিবেশকে ভালভাবে বুঝতে হবে। জ্ঞান যুক্তি ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া এসব বিষয় যথাসম্ভব তলিয়ে দেখতে হবে। কেননা, একই গুণ ভিন্ন বা বিপরীত রূপ ধারণ করতে পারে। যেমন অতিরিক্ত আত্মমর্যাদাবোধ অহংকারে পরিণত হতে পারে, বিনয় নিতে পারে বীভৎস চাটুকারীর রূপ। ধৈর্য ধারণ খুবই মহৎ গুণ, তা-ও ভীরুতার সুরত ধরতে পারে। কতক গুণ এমন আছে যে, যা আলাপ আলোচনায় আটকা থাকে না, আমলের সাথে ওসব একাকার হয়ে যায়। সত্যবাদী হওয়ার মত মহৎ গুণ অর্জন করতে হলে লাভ ক্ষতি বা আপদে বিপদে সর্বাবস্থায় সত্য বলতে হবে। সত্যবাদিতার উপর সুবক্তা হওয়া ভাল। তবে এর চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো সর্বাবস্থায় সত্য বলা। আমানত, দেয়ানতদারী এসবের বেলাতেও একথা খাটে। পরিশ্রম করেই অলসতা মুক্ত হতে হয় ও পরিশ্রমী বলে চিহ্নিত হয়। অলসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ভাল। তবে যে সোচ্চার হয় তাকে বাস্তব আদর্শ দেখাতে হবে। মন্দ লোকেরা যেসব কলাকৌশল

হীন স্বার্থে কাজে লাগায় তাতে সামাজিক জীবনকে বিভীষিকাময় করে তুলে, যেমন ধূর্তামি, প্রতারণা, সন্ত্রাস, হাইজাকিং, ভূয়া সাজা, চাঁদাবাজি, নকল ভেজাল আরো কত কিছু। এসবের আগ্রাসনে মানবতা হাঁপিয়ে উঠেছে। এ অবস্থার অবসান ঘটাতেই হবে। এজন্য সরকারের সক্রিয় পদক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়। এসবের হোতাদের উচিত শাস্তি খুবই কাম্য। সাথে সাথে তাদের শুভ বুদ্ধি উদয়ের জন্য সাংগঠনিকভাবে ব্যাপক ও বিরামহীন প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাদের প্রশিক্ষণ পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাদি করতে হবে। তাতেও যথেষ্ট হবে না। আমরা যারা ভাল হওয়ার দাবীদার তাদেরকে কলুষমুক্ত থাকতে হবে। তেমনি বিপথগামীদেরকে তুচ্ছ করে দূরে সরিয়ে রাখলে হবে না, তাদেরকে সামাজিক জীবনে উচ্চ করে তুলতে হবে। তাতে আমরা শুধু সমাজেই নয়, আল্লাহ্‌র কাছেও বড় হতে পারবো। এসবে সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি হবে পবিত্র ও বাস্তবমুখী আদর্শের শুভ পরশ।

কপট বা মোনাফেকরা নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সবকিছুই করতে পারে। তাদের প্রশংসা থাকে চাটুকারিতায় ভরপুর। নিজেদের প্রয়োজনে এরা কুটিলতা দ্বারা ভালকে মন্দে বা মন্দকে অতিভালোর রূপ ধারণ করায়। সমাজের জন্য এরা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এদের শোধরানো খুবই দুরূহ কাজ। কিন্তু এতে পিছপা হলে চলবে না।

অবক্ষয়ে ভারাক্রান্ত সমাজে সবাই চরম অশান্তি ভোগ করে। প্রসংগতঃ অবক্ষয় সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দরকার। সৃষ্টির সবকিছুরই ক্ষয় লয় আছে। কিন্তু অবক্ষয় শুধু মানুষের বেলায়ই প্রযোজ্য বলা যায়। অন্য কোন কিছুর বেলায় তা ঘটে বলা যায় না। যে ক্ষয় হওয়া উচিত নয় অথচ ঘটানো হয় তা-ই অবক্ষয়। যেমন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষয়। মানুষ স্বেচ্ছায় তা ঘটিয়ে থাকে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন হতে বঞ্চিত অন্যান্য প্রাণীর বেলায় অবক্ষয়ের প্রশ্নই উঠে না। ক্রমবিকাশশীল অর্থাৎ অগ্রসরগামী সমাজ খুবই কাম্য। এজন্য জ্ঞান ও গুণের সংযোগ ও সুসমন্বয় একান্তই জরুরী। এতে মানবতার বিকাশের পথ অনেকখানি সুগম হয়।

কর্মে বড় হবো

মানব জীবনে বড় হওয়ার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কর্মে বড় হওয়া। ভালোতে তথা সৎকাজে বড় হলে তা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য কল্যাণবহ হয়। মন্দতে বড় হলে তা সবার জন্যই ক্ষতির কারণ হয়। তাই ভালোতে বড় হওয়া খুবই কাম্য, মন্দতে বড় হওয়া সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এ প্রেক্ষিতে আলোচনায় এগিয়ে যেতে হলে সৎকাজ দ্বারা কি বুঝায়, এর উপকরণ কী কী সে ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। প্রধানতঃ সৎকাজের তিনটি উপকরণ আছে ঃ (১) কাজটি সমাজ বা কোন আদর্শ [ধর্ম প্রধান সমাজে ধর্মীয় বিধান] দ্বারা স্বীকৃত

হতে হবে।(২) যে ব্যক্তি তা করতে চায় তার নিয়্যত বা উদ্দেশ্য সৎ হতে হবে। (৩) যে পদ্ধতিতে কাজটি সমাধা করতে চায় তা-ও সৎ তথা কলুষমুক্ত হতে হবে। এর সবক'টি পূরণ হলেই তা সৎকাজ হিসেবে গণ্য হবে। এর যে কোনটাতে ত্রুটি থাকলে তা সৎকাজ থাকে না। উদাহরণ নেয়া যাক। যেমন হাসপাতাল বা বিদ্যালয় স্থাপন। অনেক সময় দেখা যায় নির্বাচনে জিতার জন্য প্রার্থীরা এসব করে দেয়ার জোরালো প্রতিশ্রুতি দেন। হারলেতো কথাই নেই, জিতলেও অনেকে ওয়াদার কথা ভুলে যায়। এসব ক্ষেত্রে স্পষ্টতঃই দেখা যায় প্রার্থীর নিয়্যতে আন্তরিকতা ছিল না। উদ্দেশ্য ছিলো চটকদার ওয়াদা দ্বারা নির্বাচনে জিতা। পদ্ধতির বিষয়টি ধরা যাক। কোন পূর্ণযৌবনা, স্বাস্থ্যবতী ও রূপসী নারী যদি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে মনে করে এসব 'বিক্রির' অর্থে হাসপাতাল করে দিবে তবে তা সৎকাজ বলে গণ্য হবে কিনা। না, তা কখনও নয়। পক্ষে যুক্তি খাঁড়া করে বলা যেতে পারে যে, তার হাসপাতালের চিকিৎসায় রোগ সারবে, রোগী উপকৃত হবে, তবে কেন এর বিরোধিতা। এখানে বিবেচনার বিষয় হলো দৈহিক রোগ সারাতে গিয়ে সমাজে ভয়াবহ নৈতিক রোগের প্রশ্রয় দেয়া, যা কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় হওয়া উচিত নয়। বস্তুতঃ সৎকাজের সব শর্ত পূরণ করেই তা করতে হবে। স্বল্প কথায় বলা যায় সৎকাজের সাথে অসৎ কিছুই যুক্ত হতে পারে না।

সৎ বা অসৎ কাজের তালিকা দিয়ে শেষ করা যাবে না। তা'ছাড়া সমাজের পরিবর্তন বিবর্তনের সাথে সৎ অসৎ উভয় ক্ষেত্রেই নতুন সংযোজন হতে থাকে। উল্লেখ্য যে, সমাজে যখন অবক্ষয়ের মাত্রা দ্রুত বাড়তে থাকে তখন এসব হতে দূরে থাকাও কম কথা নয়। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী অবক্ষয়ের ভয়াবহ আগ্রাসন চলছে। ফলশ্রুতিতে সমাজদেহ ক্রমাগত জরাজীর্ণ হয়ে পড়ছে। অসৎ কাজের তালিকা, ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা ইতিমধ্যে 'আইয়ামে জাহেলিয়তকে' অতিক্রম করে বহুদূর এগিয়ে গেছে-এ কথা বোধ হয় বিনা দ্বিধায় বলা যায়। দৈনন্দিন পত্রিকাদিতে প্রকাশিত দেশ বিদেশের অপরাধ চিত্রই এর অকাট্য প্রমাণ। সর্বগ্রাসি অবক্ষয়ের যুগে কুকর্মের লিষ্টি করতে গেলে তা হয়ত অফুরান হয়ে দাঁড়াবে। সমাজের সবাই এর কমবেশী ভুক্তভোগী। আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য প্রধান কয়েকটি উল্লেখ করছি। প্রথমে নকল ভেজালের কথা ধরা যাক। ব্যবসা বাণিজ্য, ওষুদপত্র, অপচিকিৎসা আধ্যাত্মিক চিকিৎসা এমনকি পবিত্র শিক্ষা ক্ষেত্রেও চলছে এর রাজত্ব। মাপে ওজনের ফাঁকিতে সমাজ অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় এর ব্যাপকতা উপলব্ধি করা হচ্ছে না। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, হাইজাকিং, প্রতারণা, ভুয়া, জুয়া, যৌতুকের দাবি, কুপ্রস্তাব বা সাদি বিবাহের প্রস্তাবে রাজি না হলে এসিড নিক্ষেপ করে সারা জীবনের জন্য প্রতিপক্ষকে পঙ্গু করে ফেলা, গণধর্ষণ, জমিজমা নিয়ে মিথ্যা মালি-মোকদ্দমা, সামান্য ব্যাপার নিয়ে খুনাখুনী,

মদ-মাদকতা কোন কিছুতেই অবক্ষয়ের হোতারা পেছনে পড়ে থাকতে রাজি নয়। লেন দেনের ক্ষেত্রে চলছে খেলাপি, অফিস আদালতে চলছে ঘুষের একচেটিয়া অধিকার। সেকেলে চুরি ডাকাতিতেও নিত্য নতুন চমক যোগ হচ্ছে।

এরূপ পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে অবক্ষয়ের স্রোতকে রুখে দাঁড়ানো যেমন একদিকে হবে মহান সৎকাজ তেমনি হবে স্বীকৃত সৎকাজসমূহ সমাধা করার ক্ষেত্র প্রশস্ত ও সহজতর। এজন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা তেমন কার্যকর হবে বলে মনে হয় না। মুজবুত সংগঠনের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। সমাজের সর্বস্তরে সৎ হওয়ার জন্য আন্দোলন চালাতে হবে। দৃঢ়তার সাথে নৈরাশ্য ও অসহায়তাকে পদদলিত করতে হবে। এজন্য সরকারের উপর ভার দিয়ে আমাদেরকে নিশ্চুপ নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না। অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে জনশক্তিকে সক্রিয় ও সংগঠিত করতে পারলে সরকার তখন কিছুতেই বসে থাকতে পারবে না।

ছোট বড় সৎকাজের তালিকাও ছোট নয়। বড় বড় সৎকাজে বৃহত্তর এমনকি সমগ্র মানব সমাজ উপকৃত হয়ে থাকে। সবার পক্ষে ওসব করা সম্ভব নয়। এতে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। কিছু সৎকাজের উল্লেখ করা যাক যাতে প্রত্যেকেই নিজের সাধ্যমত সৎকাজ করার দায়িত্ব বেছে নিতে পারে। যে সৎ কাজে সহযোগিতার প্রয়োজন সেখানে যৌথভাবে হিস্যা নিতে পারে। সদা নিজের মাঝে মানবতাবোধ সতেজ রাখা। অন্য কথায় বলা যায় হাজার হাজার জাতের প্রাণীর মাঝে আমি সেরা সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়েছি এবং এই শ্রেষ্ঠত্ব আমাকে সর্বাবস্থায় বজায় রাখতে হবে। নিষ্ঠার সাথে নিজের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন, সমাজের সর্বস্তরে ন্যায় ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় থাকা, সাধ্যমত সর্বস্তরে ঐক্যবোধ জাগ্রত রাখা, ধর্মান্ধতা, উগ্র দেশাত্ববোধ, এসবের বিলোপ সাধনে সক্রিয় থাকা, বিশ্ব মানবতাবোধকে প্রসারিত করা। এসব নীতি-আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে গেলে দেখা যাবে বহু সৎকাজ সমাধা করতে হয়। সমাজের জন্য কল্যাণকর অনেক ছোট ছোট কাজ আছে যা সহজেই করা যায়। রাস্তা হতে কাটা সরানো, হাসিমুখে কথা বলা, পাড়াপরশিকে দা, বটি, খন্তা, কুড়াল এসব দিয়ে (উল্লেখ্য যে, যিনি নেন, কাজ শেষ হলেই সত্বর তা ফেরত দেয়া) সাহায্য করা, তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হওয়া, বিবাদ মীমাংসা করে দেয়া এসবও মহৎ কাজ। এসবের সাথে প্রেম-প্রীতি ভালবাসার নিবিড় পরশ পরিবেশকে মধুময় করে তোলে। দুঃখের বিষয় অবক্ষয়ের হোতারা এসব হতে বঞ্চিত থাকে। এ বঞ্চনার কথাও সাধ্যমত তাদের মনের গভীরে পৌঁছানোর নিরলস প্রয়াস চালাতে হবে। তখনই উল্টা যাত্রা শুরু হবে, ওরা মানবতা বোধ ফিরে পাবে। বর্তমান পরিবেশ যতই ঘোলাটে হোক না কেন, সে সুদিন দূরে নয় বরং দ্রুত এগিয়ে আসছে। 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন'–এই মহান দায়িত্ব সরকারকে প্রয়োজন মত পালন করতেই হবে। এতেই সমাজ দূষণমুক্ত করা যাবে বলে মনে হয় না। এজন্যে

কোরআনে পূর্ণতা লাভ করেছে। এ মহান আহ্বানে সক্রিয় সাড়াতেই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয় এবং আল্লাহ্‌র কাছ হতে নেয়ামতপ্রাপ্ত সকল নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। তাতে আমাদের জীবনে 'ইহদিনাসিরাতাল মুস্তাকীম' দোয়ার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে।

কোরআনে নির্দেশিত সৎকাজের কিছুটা উল্লেখ করে আলোচনা করলে বিষয়-বস্তু হৃদয়ংগম করা সহজতর হবে ঃ যেমন, মাতা পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দয়ালু হওয়া, তাদের সেবা যত্নে তৎপর থাকা এবং কখনও তাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ না করা। এতীমদের প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকা। গরীব মিসকীনদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থাদি করা (যার আধুনিক রূপ হলো 'দারিদ্র বিমোচন')। সৎজীবন যাপন। সৎকাজে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা করা। সহযোগিতা করার তাৎপর্য হলো–মানুষকে সৎকাজ চিহ্নিত করতে সহায়তা দান ও সমাধা করতে উৎসাহিত করা। এতে প্রতিযোগিতার লক্ষ্য হবে সৎকাজ করতে গিয়ে অপরাপরদেরকে অতিক্রম করে যাওয়া। কর্তব্য পালনে অটল ও দৃঢ় থাকা। মেজাযকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, বিশেষভাবে উগ্রতা পরিহার করা, সঠিক সাক্ষ্য দেয়া, এতে কোন কিছু গোপন না করা, ঘুষ না খাওয়া, না দেয়া। সদা ন্যায়ের পক্ষে থাকা। সঠিকভাবে আমানত আদায় করা। যথাসম্ভব পরামর্শ করে কাজ করা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা। দোয়ার সাথে অন্যদের অভিবাদন জানানো যেমন, আস্‌সালামু আলায়কুম (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক) বলা। পাপ কাজে এবং সীমা লঙ্ঘনে কাকেও সহায়তা না দেয়া। কখনও কুকাজের ষড়যন্ত্র না করা। সন্দেহ প্রবণতা হতে বেঁচে থাকা। পরনিন্দা হতে দূরে থাকা। কখনও ব্যভিচারী না হওয়া। বিবাহিত জীবন যাপনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। স্বামী স্ত্রীর যৌথ প্রয়াসে মানবতার বিকাশ সাধন। নারীর প্রধান কাজ হলো সুষ্ঠুভাবে সন্তানের লালন পালন, গৃহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন। পুরুষের প্রধান কাজ পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন। কোরআনে স্বামী স্ত্রীকে একে অন্যের পোষাকস্বরূপ বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য খুবই ব্যাপক। পোষাক আমাদেরকে শীতাতপ হতে রক্ষা করে। স্বামী স্ত্রীও সুখ দুঃখে এক অন্যের ঘনিষ্ঠ সাথী হয়। পোষাক লজ্জা নিবারণ করে ও দেহের শোভা বাড়ায়। বিবাহিত জীবন ও যৌন জীবনকে সুন্দর ও মহিমাময় করে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে পোষাক সনাক্ত করণে সহায়ক হয়। বিবাহও তেমনি নরনারীকে সমাজে স্বামী স্ত্রী রূপে সনাক্ত করে থাকে ইত্যাদি। চুরি না করা। ইন্দ্রিয়াদির হেফাযত করা অর্থাৎ ওসবকে কলুষমুক্ত রাখা। দাম্ভিক বা উদ্ধত না হওয়া। বিনম্রভাবে চলাফেরা তথা আচার আচরণ করা। কখনও মিথ্যা না বলা। লিখিতভাবে লেনদেন করা। সৎলোকের সংসর্গে থাকা। মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করা ও অন্যায় হতে বিরত রাখা। এমন কি মূর্তিকে গালি না দেয়া। আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচপাতি করা। সমাজে কখনও বিশৃংখলা সৃষ্টি না করা।

কখনও বে-আইনিভাবে হত্যা না করা। সুদ না খাওয়া। শর্তাদি পূরণ হলে যাকাত আদায় করা। সালাম না বলে ও অনুমতি না পেলে কারো গৃহে প্রবেশ না করা। কোন জাতিকে বিদ্রূপ না করা। নেশা না করা ও জুয়া না খেলা। ওজনে মাপে সঠিক থাকা। দয়ার্দ্র হৃদয় ও বিনীতভাবে কথা বলা। আল্লাহ্‌র আনুগত্য, এই নবীর [হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)] আনুগত্য ও যারা আদেশ দেয়ার অধিকারী তাদের আনুগত্য করা। একটু গভীরভাবে বিবেচনা করলেই উপলব্ধি করা যায় যে, এসব আদেশ নিষেধের লক্ষ্য হলো সৎমানুষ তথা মোমেন মুত্তাকী তৈরি করা এবং তাদের মাধ্যমে সৎপরিবার ও সৎসমাজ গড়ে তোলা।

ইসলামের দৃষ্টিতে বড় হওয়া (খ)

ইসলামের দৃষ্টিতে বড় হওয়ার 'ক'তে উল্লেখিত আদেশ নিষেধ ছাড়াও কোরআনে আরো অনেক বিধি-বিধান রয়েছে–যা পরিপূর্ণ জীবন বিধানের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কোরআনে আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেছেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীনরূপে মনোনীত করিলাম।' [৫ঃ৪ আয়াতাংশ] এই পূর্ণতা ও মনোনয়ন শুধু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)- এর সময়ের লোকজন এবং বিরাজিত সমাজ ব্যবস্থাদি, মতবাদ ও বিভিন্ন ধর্মের সাথে তুলনামূলক ভাবেই নয়, পরবর্তী কালেও বিশ্বের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। সীমিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দরুন এ দাবির ব্যাপকতা (স্থান ও সময় উভয় দিক থেকে) কোন মানুষের পক্ষে সম্যক অনুধাবন করা সম্ভবপর না হওয়াই স্বাভাবিক। একমাত্র সর্বজ্ঞানী সর্বদ্রষ্টা ও সদা সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ্‌র পক্ষে তা শুধু সম্ভবই নয় অতীব সহজ বলা যায়। এ নিয়ে কথা না বাড়ায়ে দুনিয়ায় ও বিশেষ করে মোসলেম জাহানে বিরাজিত বর্তমান অবস্থা এবং এর সাথে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের সম্পর্ক এবং ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা উপলব্ধি করা সহজতর হবে। তা'ছাড়া প্রকৃত ইসলাম ও এর নিষ্ঠাবান অনুগামীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সব সন্দেহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে বড় হওয়ার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো নিজে অবক্ষয়মুক্ত থেকে অবক্ষয়মুক্ত পরিবার ও সমাজ গড়ে তোলার সংগ্রামে নিরলস প্রয়াস চালানো। এ উদ্দেশ্যে কোরআনে বারবার তাগিদ এসেছে ঈমান এনে পুণ্য কাজ দ্বারা মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর জন্যে। বস্তুতঃ মানুষ যখন অবক্ষয়ের আগ্রাসনে এসব ভুলে গিয়ে দিশে হারা হয়ে পড়েছে তখনই নবী-রসূল পাঠিয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর সেরা সৃষ্টিকে পথের সন্ধান দিয়েছেন। এ তাঁর অনড় বিধান। এর ভিত্তিতে হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত লক্ষাধিক প্রেরিত পুরুষের শুভাগমন ঘটেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শৈশবকালে তাদের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার ও প্রসারের সুযোগ সুবিধাদি খুবই সীমিত ছিলো। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের আগমন ঘটেছে গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, উপজাতি, জাতি বা এলাকাকে ভিত্তি করে।

তবে সবার আগমনের উদ্দেশ্য যেমন ছিলো একই তাদের মৌলিক শিক্ষার মাঝেও তেমন কোন ব্যবধান ছিল না। পরবর্তীতে অনুগামীরা ধর্মের মাঝে নানা ভেজাল সৃষ্টি করেছে। তাতে ধর্মীয় ব্যবধান, বিশ্ব মানবতাবোধ জাগ্রত করে একই বিশ্ব গড়ার পথে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বাধা দূর করার জন্য বিরামহীনভাবে বলতে হবে এ ব্যবধান কৃত্রিম। মানুষকে তার মনুষ্যত্ব রক্ষা ও বিকাশের শিক্ষা ও আদর্শ রপ্ত করার সাথে সাথে আল্লাহ্ মুখী হতে হবে যে আল্লাহ্ সবার স্রষ্টা। তাতে সবাই লাভবান হবে, কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। দিনে দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অচিন্তনীয় অগ্রগতি ও ব্যাপক প্রসার ঘটে চলেছে। তাতে বিভিন্ন দেশ ও এলাকার মাঝে নানা জরুরী কারণে যাতায়াত ও যোগাযোগ বেড়েই চলেছে। তাতে অভিন্ন বিশ্ব সমাজ গড়ে তোলার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতাও আদম সন্তানদের মনমানসিকতায় প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে ওঠছে। এরই প্রতিফলন দেখা যায় বিশ্ব সংস্থাদি যেমন 'লীগ অব ন্যাশনস্', 'জাতি সংঘ', জাতি ধর্ম বর্ণের উর্দ্ধে উঠে সমগ্র মানবতার সেবার জন্য রেডক্রস, রেডক্রিসেন্ট ইত্যাদি গড়ে তোলার মাঝে। বর্তমানে প্রতিবছর শতাধিক 'বিশ্ব দিবস' পালিত হচ্ছে। এমনকি ক্রীড়া ক্ষেত্রেও 'বিশ্ব অলিম্পিকের' পত্তন ঘটেছে।

সব মানুষের একই স্রষ্টা 'বিশ্ব নবীর' রূপে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে পাঠিয়েছেন সমগ্র বিশ্বকে অবক্ষয় মুক্ত করতে ও বিশ্ব সমাজ গড়তে। এজন্য আদম সন্তানদেরকে দেশ, বর্ণ, বিভিন্ন ধর্ম এসবের বেড়াজালে শৃংখলিত না রেখে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে একই মানবজাতিভুক্ত হওয়ার ধ্যান-ধারণায় দ্রুত এগিয়ে নেয়া।

এ দাবীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ ওঠতে পারে তন্মধ্যে প্রধান হলো ঃ (১) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের পূর্ণতার বাণী নিয়ে দুনিয়ায় হাজির হয়েছেন প্রায় দেড় হাজার বছর হতে চলেছে। এ দীর্ঘ সময়ে সব ফির্কার মুসলমানদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২৫ কোটির মত যা বিশ্বের মোট জন সংখ্যার (বর্তমানে তা প্রায় ৬০০ কোটি) $\frac{1}{4}$ শতাংশের কম। এ সংখ্যাতেও ভেজালের অন্ত নেই। 'ফির্কাবাজী কুফুরী ফতোয়া ও ইসলাম' পুস্তিকায় লেখক ১১৫টি ফির্কার নাম উল্লেখের পরও 'প্রভৃতি' শব্দটি যোগ করেছেন। এসবের কোন কোনটি কলেমাতেও ভেজাল ঢুকিয়েছে। একদল অন্য দলকে কাফের ফতোয়া দেয়াতো বাংলা দেশের 'পান্তা'র মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে এ ধরনের উম্মাহ্র মাঝে ইসলামি আদর্শের সামগ্রিক ও সামাজিক রূপের সন্ধান করা বৃথা। এরূপ 'ইসলামহীন মুসলমানদের' পক্ষে ভিন্ন আদর্শ ও ধর্মাবলম্বীদেরকে ইসলামে আহ্বান করতে যাওয়া কতটুকু সম্ভব ? আর গেলেও তা যে হবে ব্যর্থতার চরম গ্লানি বহন করা তাতে সন্দেহের বিন্দু মাত্রও অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। (২) বর্তমানে সারা দুনিয়ায় অবক্ষয়ের জোয়ার বইছে আর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে চলছে চূড়ান্ত ভাটা। এই জোয়ার ভাটার ক্ষেত্রে যে কথাটি নির্দ্বিধায় বলা যায় তা হলো এর নিকৃষ্টতম স্তরে আছে বোধ করি মুসলিম জাহানের প্রায়

সবাই। বস্তুতঃ অবক্ষয়ের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তথাকথিত মুসলমানদের জোরালো উপস্থিতি নেই। যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন বাস্তবতা চীৎকার করে তা-ই ঘোষণা করছে। এই পরিবেশে ইসলাম দ্বারা অবক্ষয়মুক্ত সমাজ গড়ে ওঠবে এরূপ উচ্চারণ পাগলের প্রলাপকে ছাড়িয়ে যায় বৈ কি ! মুসলিম উম্মাহ্ খেলাফত হারিয়ে নেতৃত্বহীন অবস্থায় ছিন্নভিন্ন হয়েই ক্ষান্ত নয়, দেশে দেশে নিজেদের মাঝে চরম মারামারি হানাহানিতে সকল শক্তি সামর্থ্য ক্ষয় করে নিশ্চিতভাবে অনিশ্চিতের যাত্রী হয়ে চলেছে। নিজেদের মূল্যায়ণের সামর্থ্যও তারা হারিয়ে ফেলেছে। এ অবস্থায় তাদের পক্ষ হতে নতুন বিশ্ব গড়ার মত বড় কথা বলা ও কাজের আহ্বান জানানো বৃথা স্বপ্ন ছাড়া আর কি হতে পারে!

এই পরিস্থিতেই আল্লাহ্র হুকুমে প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়পদে এগিয়ে যাচ্ছে। এ দুর্দিন দূর হবেই। শুধু মুসলমানই নয় বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের লোকের অন্তরে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার আলোকে প্রজ্জলিত করেই তারা সৎলোক, সৎসমাজ ও সৎবিশ্ব গড়ার মহান কাজে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই জামাত মানবীয় শক্তি সামর্থ্য বা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিতে এসব দাবী করছে না। সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্র ইচ্ছার দাসরূপেই এসব দাবী পেশ করছে এবং দ্বিধাহীন চিত্তে অবক্ষয়ে ডুবন্ত দুনিয়াকে আশার বাণী শুনাচ্ছে।

মুসলমানদের চরম দুর্দিনের ভবিষ্যদ্বাণী যেমন আছে, তেমনি আছে পুনর্জাগরণ ও বিশ্বজয়ের কথা ; যে জয়ে কারো পরাজয় নেই। কেননা, এ জয় সত্যের জয়, মনুষ্যত্বের জয়, মহত্বের জয়।

প্রথমে পতনের কথা বলা যাক। কোরআন পাকে মোমেন মোত্তাকীদেরকে বার বার সাবধান করা হয়েছে যেন তারা 'সিরাতাল মুস্তাকীম' হতে সরে না যায়। পতনের সমূহ সম্ভাবনা না থাকলে এসব সাবধান বাণী অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। হাদীসে আল্লাহ্র রসূল স্পষ্ট ভাষায় বিশ্ববাসী এবং মুসলমানদের চূড়ান্ত অধঃপতনের ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছেন, এমন এক সময় আসবে যখন ঃ

(১) "ধর্মীয়জ্ঞান উঠিয়া যাইবে, জাহেলিয়্যত (আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা) প্রসার লাভ করিবে, মদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার হইবে, পুরুষের সংখ্যা কম হইবে এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, পুণ্য কাজ কমিয়া যাইবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরিয়া যাইবে, ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পাইবে, মারামারি কাটাকাটি বেশী হইবে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈমানদারের অভাব হইবে, ভূমিকম্প বেশী হইবে, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে, বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া মানুষ গৌরব অনুভব করিবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার প্রচলন হইবে, দলের সর্দার ফাসেক (দুর্নীতিপরায়ণ) হইবে, জাতির নীচ লোক তাহাদের নেতা হইবে, বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীর প্রাধান্য হইবে, উট্নী বেকার হইবে, উহাতে চড়িয়া মানুষ দূরদেশে যাতায়াত করিবে না।" (বুখারী, মুসলিম)

(২) "মানুষের উপর এমন এক সময় আসিবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকিবে। তাহাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হইবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকিবে। তাহাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হইবে। তাহাদের মধ্য হইতে ফেৎনা-ফাসাদ উঠিবে এবং তাহাদের মধ্যেই উহা ফিরিয়া যাইবে।" (বায়হাকী, মিশকাত)

প্রথমোক্ত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে সমগ্র মানব-জাতির অবক্ষয়ের এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে সাধারণভাবে মানুষের কথা বলার পর স্পষ্ট ভাষায় ইসলাম, কুরআন ও মসজিদের অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর আলেমগণের বিষয় অতীব গুরুত্বসহকারে বলা হয়েছে। তা যদি কল্যাণের হতো তবে আমাদের জন্য খুবই আনন্দের কারণ ও উন্নতির উৎস হতো। কিন্তু বড়ই বেদানাদায়ক যে, আলেমগণকে 'আকাশের নিম্নস্থ নিকৃষ্টতম জীব' বলা হয়েছে। সাথে সাথে তাদের আচরণের মারাত্মক দিকটিরও উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবতার প্রেক্ষিতে হাদীস দু'টোর বিভিন্ন দিক বিচার-বিশ্লেষণ করলে সন্দেহাতীতভাবে বুঝা যায় যে, এই যামানার কথাই বলা হয়েছে। কেননা, সমাজের সর্বস্তরে ধর্মীয় ফেৎনা-ফাসাদের মূল ও প্রধান হোতারা যে মোল্লা ভাইয়েরা ও পীর মাশায়েখদের একটা প্রধান অংশ তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। তাই আমাদের এই যামানার আলেমদের আহ্বানে সাড়া দিতে খুবই সাবধান হতে হবে যাতে আমরা তাদের সৃষ্ট ফেৎনা-ফাসাদের বেড়াজালে আটকা পড়ে নিজেদের অমূল্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে ব্যর্থ না করে ফেলি। অপরদিকে আল্লাহ্তা'লা কোরআন পাকের হেফাযতের ভার নিজে নিয়েছেন যেমন বলেছেন ঃ 'আমরাই এই ধর্ম-ব্যবস্থাকে অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমরাই ইহার সংরক্ষক।' [১৫ঃ১০] তাই কোরআন পাকের অক্ষর, শব্দ ও বাক্যে কোন পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন প্রক্ষিপ্ত করতে না পারলেও তারা বসে নেই। কোরআন পাকের ব্যাখ্যায়, হাদীসে এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনে নিজেদের খেয়াল খুশীমত তারা অযথা অপ্রয়োজনীয় ও বিভ্রান্তিকর অনেক কিছুরই দেদার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, ঘটাচ্ছে। এসবই মুসলমানদের অজ্ঞানতা ও পতনের পথ প্রশস্ত করছে এবং ইসলামের প্রকৃত আদর্শকে ঢেকে ফেলছে। তাতে প্রধানতঃ মানবতা তিনভাবে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে ঃ (১) ভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের লোকেরা ইসলামকে খুবই হেয় দৃষ্টিতে দেখে এবং তা হতে দূরে সরে থাকে। (২) মুসলমানদের মাঝে যারা ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ তারা এসবকে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ মনে করে কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন হয়ে অনেক অনর্থ ঘটায় ও মানবতার বিকাশে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। (৩) আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানেরা ইসলামের মূল শিক্ষা ও আদর্শ সম্বন্ধে তলিয়ে না দেখে দূরে সরে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠতে পারে, 'ফলেই বৃক্ষের পরিচয়'। কথাটা সত্য তবে নিশ্চয় কাচা ফলে পূর্ণপরিচয় মিলে না। আর পচা ফলে তো মোটেও নয়।

নেতিবাচক আলোচনার ইতি টেনে ইতিবাচক বিষয়ে যাওয়া যাক। আল্লাহ্ বলেন (বাংলা তর্জমা) ঃ সেই তিনি, যিনি তাঁহার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্যসহকারে পাঠাইয়াছেন, যেন তিনি উহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিতে পারেন, মোশারেকগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন।' (৬১ঃ১০)

রসূল করীম (সাঃ)-এর নবুওয়তকাল (২৩ বছর) কেটেছে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করতে। সমগ্র বিশ্বে এর প্রসার ঘটানোর দায়িত্ব ছিলো তাঁর পরবর্তী অনুগামীদের উপর। সীমিত সময়ের পর তারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের ব্যর্থতার কথা ও পরিণতি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে বলা হয়েছে। যাই হোক না কেন উদ্ধৃত আয়াতে 'জয়-যুক্ত'-এর যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা কখনও ব্যর্থ হবার নয়। সে বিষয়টিই সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতের দ্বারা যে ঈমান ধরায় ফিরে আসবে ও ইসলাম জয়যুক্ত হবে তা হুযূর (সাঃ) স্পষ্টভাবে বলে গেছেন। যেমন, "হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সালমান ফারসী (রাঃ)-এর উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, ঈমান সপ্তর্ষিমন্ডলে চলিয়া গেলেও তাঁহাদের (পারশ্য বংশোদ্ভূত) এক বা একাধিক ব্যক্তি তথা হইতে উহাকে নামাইয়া আনিবে"।(বুখারী) সূরা নূরে আল্লাহ্-যারা ঈমান এনে পুণ্য কাজ করবে-তাদের মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছেন। তা'ছাড়া ওহী দ্বারা আল্লাহ হযরত ইমাম মাহদী মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে জানিয়েছেন যে, তাঁর মাধ্যমে ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুনর্বাসন হবে। বর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতেই খেলাফত প্রতিষ্ঠিত আছে। 'তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়ন' পুস্তকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন, 'অতঃপর আজ হইতে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ হইবে না যখন ঈসা (আঃ)-এর অপেক্ষাকারীরা, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকলে অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হইয়া মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিবে তখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হইবে এবং একই নেতা। আমি তো একটি বীজ বপন করিতে আসিয়াছি। সুতরাং আমার হাত দ্বারা ঐ বীজ বপন করা হইয়াছে। এখন ইহা বৃদ্ধি লাভ করিবে এবং বিকশিত হইবে। কেহ ইহাকে প্রতিহত করিতে পারিবে না।'

তিনি আরো বলেছেন, 'দেখ ঐ যুগ আসছে, বরং নিকটে এসে গিয়েছে, যখন আল্লাহ্তা'লা এই সিলসিলাকে পৃথিবীতে অত্যন্ত বরণীয় করে তুলবে। এটি পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে প্রসার লাভ করবে এবং দুনিয়ায় ইসলামের প্রকৃত অনুসারী হিসাবে একমাত্র এই সিলসিলাকেই বুঝাবে। এ সেই আল্লাহ্তা'লার বাণী, যাঁর কাছে কোন কিছু অসম্ভব নয়।' (তোহফায়ে গুলড়াবিয়া)। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৮৮৯ সালের ২৩ শে মার্চ আহমদীয়া মুসলিম জামাত কায়েম করেছেন। তাঁর ওফাতের পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই জামাত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। সত্যের শত্রুদের দ্বারা সৃষ্ট হাজারো বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এই জামাত আল্লাহ্র অসীম মেহেরবানীতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে

যাচ্ছে। বর্তমান খলীফা বলেছেন, এ জামাতের বিশ্ব বিজয় ইনশাল্লাহ্ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যেই সমাধা হবে। আল্লাহ্ তা-ই করুন, আমীন। বাস্তব অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হলো। আশা করি এতে এই জামাতের দাবী সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হবে।

মিশন ঃ এ যুগ প্রচারের যুগ। সামান্য স্নো পাউডার নিয়ে প্রচারণার অন্ত থাকে না। মতবাদ বা ধর্মীয় আদর্শ প্রচারের জন্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে হয়। এসব কেন্দ্রকে 'মিশন' বলা হয়। বর্তমান (১৯৯৬) ১৫৬টি দেশে এ জামাতের অধীনে ১০,৫২৭টি মিশনের মাধ্যমে প্রচার ও তালীম তরবীয়তের কাজ চলছে। পাক-ভারত-বাংলাদেশে এ হিসাবে ধরা হয়নি। লন্ডনের চল্লিশ মাইল দূরে টিলফোর্ড নামক এলাকায় ২৫ একর জমিতে 'ইসলামাবাদ' নাম দিয়ে এক বিরাট ইসলাম প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

মসজিদ ঃ বিভিন্ন মহাদেশে ৫৬০৭টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এ হিসেবেও পাক-ভারত-বাংলাদেশ নেই।

খ্রীষ্টান ধর্মের প্রধান কেন্দ্র লন্ডন, ওয়াশিংটন, ডেটন, দিহেগ, হামবর্গ, ফ্রাঙ্ক ফোর্ট, জুরিখ, নিউ ইয়র্কসহ বহু নগরী হতে প্রত্যহ পাঁচবার সুমধুর আযান ধ্বনী শুনা যায়। দীর্ঘ সাতশত বৎসর পর স্পেনের গ্রেড্রোবাদেও স্থাপিত হয়েছে এক বিশাল মসজিদ, কেনাডার ওন্টারিও শহরের নিকটে স্থাপিত হয়েছে ৫ হাজার মুসুল্লির ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মসজিদ।

বিদ্যালয় ঃ ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য এশিয়া ও বিশেষ করে আফ্রিকায় বহু সংখ্যক স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ স্থাপিত হয়েছে। এসবে শুধু আহমদী নয় বিপুল সংখ্যক অ-আহমদীরাও শিক্ষা লাভ করে থাকে।

হাসপাতাল ঃ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ৩১টি হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা এসব পরিচালিত হচ্ছে।

পত্রিকা ঃ বিভিন্ন স্থান হতে ১৭টি ভাষায় এই জামাতের নিজস্ব প্রেসে৭৯টি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

এম টি এ ঃ [মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া] হতে পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে কয়েকটি ভাষায় দিবারাত্রি ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ বিশ্ববাসির ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। এর আশাতীত ফলও পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৯৪ সালে বয়াতকারীদের সংখ্যা ছিলো ৪ লাখের কিছু বেশী। ১৯৯৫ সালে ৮ লাখের উর্ধ্বে এবং ১৯৯৬ সালে তা দাঁড়ায় ১৬ লাখের বেশী এবং ১৯৯৭ সালে বয়াতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০ লাখের উপরে। আলহামদুলিল্লাহ্। আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহার অবক্ষয়ের ক্ষেত্রকে কল্পনাতীতভাবে সম্প্রসারিত করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না বরং এতে নিত্য নতুন আইটেমের সংযুক্তি ঘটানো হচ্ছে। অপরদিকে এই প্রযুক্তিই আহমদীদের দ্বারা ইসলাম প্রচারের 'মহা অস্ত্রে' পরিণত হয়েছে।

কোরআনের অনুবাদ ঃ ইতিমধ্যে ৬০টি ভাষায় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ইসলাম প্রচারের মহান কাজে এসব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আরো ৫৬টি ভাষায় কোরআনের তর্জমা প্রকাশনার কাজ এগিয়ে চলেছে।

অন্যান্য পুস্তিকাদি ঃ

ইসলামের প্রচারকে বিভিন্ন দেশের তৃণমূলে সহজ সুন্দরভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য ব্যাপক প্রয়াস চলেছে। ১৪০টির বেশী স্থানীয় ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপনাদি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় যাতে সর্বস্তরের লোকজন কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে সহজেই প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে পারে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে মৌখিক ও চিঠি-পত্রাদি দ্বারা তবলীগ করে থাকেন। বর্তমান যুগ কলমের যুগও। এ যুগের সন্ধান কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) লেখাপড়া না জানলেও তাঁর কাছে নাযেলকৃত প্রথম ৫ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ বলেন ঃ 'যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে উহা যাহা সে জানিত না।' (৯৬ঃ৫-৬) 'এবং পুস্তক-পুস্তিকা বিস্তৃত করা হইবে।' (৮১ঃ১১)। এ দেশের একটি উদাহরণ নিলে বিষয়টি হৃদয়ংঙ্গম করা সহজ হবে। সংসদে তথ্য প্রতিমন্ত্রী জানান ঃ রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশ হওয়া দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ১১৬টি। ঢাকা থেকে প্রকাশ হওয়া সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা ৩৭০টি। পাক্ষিক পত্রিকার সংখ্যা ১২৯টি। মাসিকের সংখ্যা ২৭০টি। দ্বি-মাসিক পত্রিকার সংখ্যা ৫টি এবং ত্রৈমাসিক পত্রিকার সংখ্যা ৫০টি। (সংবাদ, ২.৯.৯৫)। দেশের অন্যান্য স্থান হতে প্রকাশিত পত্রিকাদির সংখ্যার উল্লেখ নেই। তা'ছাড়া বছরে প্রকাশিত পুস্তকাদি ধরা হয়নি। দু'একশত বছর আগে এমনটি হয়তো ভাবাই যেতো না। কোরআনের ৬৮ নম্বর সূরার নাম 'আল্ কালাম'। এ কালামের বাংলা উচ্চারণ হলো 'কলম'। তা'ছাড়া হযরত ইমাম মাহদী মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ 'সুলতানুল কলম' (কলম সম্রাট) উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ঐশী প্রেরণা ও সহায়তায় তিনি ৮০ খানারও অধিক পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রায় লক্ষাধিক চিঠি-পত্র লিখে গেছেন। এসবের সম্পর্কে কিছু বলে নিলে বোধ হয় কলমের জেহাদের গুরুত্ব উপলব্ধি সহজতর হবে। এজন্য দু'টো হাদীসের উদ্ধৃতি যথেষ্ট হবে বলে মনে হয়। যেমন ঃ (১) হুযুর (সাঃ)-এর যুদ্ধ কালীন নির্দেশ হলো, 'সৎলোকের প্রাণবধ করিও না, শিশু, রোগী ও নারীর উপর অত্যাচার করিও না, লোকের বসতবাটি, খাদ্য সামগ্রী ও ফলবান বৃক্ষ নষ্ট করিও না।' যুদ্ধ ক্ষেত্রেও জীবন ও পরিবেশ রক্ষার কি অপূর্ব শিক্ষা ও আদর্শের আহ্বান। এসব পালন করলে আধুনিক যুদ্ধের বহু মর্মান্তিক জ্বালা যন্ত্রণা হতে রেহাই পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় হাদীসটি হলো, 'তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা দেখিতে পাইবে ঈসা ইবনে মরীয়মকে ন্যায় বিচারক ইমাম মাহদী রূপে। তিনি ক্রুশ (ক্রুশীয় মতবাদ) ধ্বংস করিবেন এবং শূকর (বদযবান ও নির্লজ্জ ব্যক্তিদিগকে রূহানীভাবে) নিধন করিবেন ও ধর্ম-যুদ্ধ রহিত করিবেন।'

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)। বর্তমান যুদ্ধে যেসব আধুনিক অস্ত্রাদি যেমন আনবিক বোমা ব্যবহৃত হয় তাতে প্রথম হাদীসে উল্লেখিত নীতি অবলম্বন করা মোটেও সম্ভবপর নয়। তাতে দ্বিতীয় হাদীসে উল্লেখিত 'ধর্ম-যুদ্ধ রহিত করিবেন' ছাড়া উপায় নেই। বস্তুতঃ সর্বনাশী ও সর্বগ্রাসী যুদ্ধ রহিত করার চেয়ে মানবতার জন্য বড় কোন কাজ হতে পারে না। এ কাজটিই আহমদীয়া মুসলিম জামাত করতে যাচ্ছে এবং তা সাধিত হবে কলমের মাধ্যমেই। কলমের জেহাদে আমাদেরকে প্রধানতঃ ৫টি ফ্রন্টে কার্যকর তৎপরতা চালাতে হবে। যেমন ঃ (১) বিধর্মী ও ভিন্ন মতবাদের লোকদের ইসলাম বিরোধি অপপ্রচারের যথাযথ প্রামাণিক জবাব দিতে হবে। (২) তাদের ধর্মের বা মতবাদের অযৌক্তিকতা তাদের কিতাবাদি হতে অকাট্যভাবে শালীন ভাষায় তুলে ধরতে হবে। তাদের প্রতি প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার আন্তরিক আবেদন থাকতে হবে। তারা যেন হৃদয়ংগম করতে পারে যে, তাদেরকে কোনভাবেই হেয় করা নয়, সত্যের সন্ধান দেয়াই লক্ষ্য। (৩) অভ্যন্তরীণ জঞ্জাল সাফাই করতে হবে। অর্থাৎ চরম ধর্মীয় গোঁড়ামীতে আক্রান্ত মোল্লা, পীর,ফকির, মাশায়েখ ভাইয়েরা কোরআন, সুন্নাহ ও সহী হাদীস বহির্ভূত ধ্যান-ধারণা দ্বারা ইসলামের সৌন্দর্যে যে কালিমা লেপন করে চলেছে সমূলে এর উৎপাটন করতে হবে। কাজটি খুবই কঠিন। তাই বলে পিছপা হলে চলবে না। (৪) অশ্লীলতা প্রচারের বিষময় রূপ ও ফল বিশেষ করে আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য কত ক্ষতিকর সমাজের সামনে তুলে ধরতে হবে। (৫) সর্বোপরি কোরআনের সঠিক শিক্ষা ও আদর্শের গুরুত্ব, আবশ্যকতা ও অনুপম সৌন্দর্য দুনিয়ার সামনে পেশ করতে হবে। সাথে থাকবে আমাদের আচার আচরণের উজ্জ্বল নমুনা। আমাদেরকে সদা স্মরণ রাখতে হবে যে, উদাহরণ নীতি বাক্যের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর। বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র কাছে মানবতার উদ্ধারের জন্য সবচেয়ে বড় কাজ হলো আল্লাহ্ কর্তৃক সংরক্ষিত বাণীকে অর্থাৎ কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শকে নিষ্ঠার সাথে তাঁর অগণিত বান্দাদের ঘরে ঘরে, পৌঁছে দেয়া। তাদেরকে মনে প্রাণে আল্লাহ্‌মুখী করা। তাতেই সব অবক্ষয় হবে গৃহ হারা, ভূবন ছাড়া।

এই মহা কল্যাণময় কর্মসূচীতে আমরা ইন্‌শাল্লাহ্ সফল হবোই। এর কিছু নিদর্শন অ-মুসলমান ভাইদের চিন্তা চেতনা ও কলম হতে প্রকাশ পাচ্ছে। মাইকেল এইচ হার্ট লিখিত দি হান্ড্রেড (The 100) পুস্তকে ইতিহাসের সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অবস্থান নির্দিষ্ট করতে গিয়ে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রথম স্থান দেয়া হয়েছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে বলা হয়েছে ঃ 'ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় এবং বৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রেই সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছেন। আরো বলা হয়েছে, বর্তমানে মৃত্যুর ১৩ শত বৎসর অতিক্রম করার পরও তাঁর অতীব জোরালো ও ব্যাপক প্রভাব বিরাজ করছে।' জর্জ বার্নাড শ' বলেছেন যে, বর্তমানে বিশ্বের জটিল সমস্যাদি সমাধানের জন্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মত ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-ই ঐ ব্যক্তিত্ব যিনি কোরআনের মোহাম্মদ (সাঃ)-কে অন্তরে বাহিরে

সম্যক ধারণ করেছেন এবং বিশ্ব দরবারে তাঁকে সঠিকভাবে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্'তালা আমাকে প্রেরণ করেছেন যেন আমি প্রমাণ করে দেখাই যে, কুরআন মজীদ একটি জীবন্ত গ্রন্থ, ইসলাম একটি জীবন্ত ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জীবন্ত নবী (অর্থাৎ এদের প্রভাব চিরস্থায়ী)। (আল্ হাকামঃ ৩১শে মে, ১৯০০) তিনি আরো বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্তা'লা আমাকে এ যুগের সংস্কারের জন্য প্রেরণ করেছেন, যেন আমি মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট এমন ভুল-ভ্রান্তিসমূহকে দূরীভুত করি যা আল্লাহ্র বিশেষ ঐশী সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। আর যারা ইসলাম ধর্মের অস্বীকারকারী তাদেরকে প্রমাণ করে দেই সত্যি সত্যিই আল্লাহ্ জীবিত আছেন। ইসলামের মহিমা ও মো'জেযার মাধ্যমে তাদের সামনে প্রমাণ করে দেখাই' (বারাকাতুদ্ দোয়া)।

আল্লাহ্র নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাত অম্লান বদনে সর্বপ্রকার ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করে ইসলামের বিশ্ব বিজয়কে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছে। বিশ্ববাসীর কাছে বিনীত আবেদন আমাদের কথা আমাদের কাছ থেকে শুনুন। আমাদের পুস্তকাদি পড়ে আমাদেরকে জানুন। আমাদের আচার আচরণ দেখে সঠিকভাবে চিনুন। সর্বোপরি একাগ্রচিত্তে দোয়ার দ্বারা সত্য গ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিন। আল্লাহ্ বান্দাদের ডাকে সাড়া দেন একথা কোরআনে বার বার উল্লেখ করেছেন। সূরা আল্ মোমেন হতে একটি আয়াতের অংশ বিশেষের তর্জমা দেয়া হলো। "এবং তোমাদের প্রতিপালক বলিতেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো।"(৪০ঃ৬১) আল্লাহ্ আমাদের সবার সহায় হোন। আমীন।

বড় হওয়ার দায়িত্ব ও প্রস্তুতি

জীব জগতে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ খুবই সুস্পষ্ট। তাই তাকে দায়িত্বশীল বা কর্তব্যপরায়ণ প্রাণী বলে আখ্যায়িত করা যায়। তার দায়িত্বের সীমা রেখা টানা দুরূহ। অন্যান্য প্রাণীর দায়িত্ববোধ থাকলেও তা খুবই ক্ষীণ ও সীমিত। মানুষের বেলায় ব্যক্তি নিজে, সমাজ বা স্রষ্টা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দ্ধারণ করে থাকেন। যখন কারো বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায় তখন বুঝতে হবে ঐ লোক কোন অস্বাভাবিকতায় যেমন দৈহিক বা মানসিক পীড়ায় বা অলসতায় ভুগছে অথবা বখাটে হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। বস্তুতঃ সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন দ্বারা জীবন যেমন সার্থক হয় তেমনি এর প্রতি অবহেলা অমূল্য মানব জীবনকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। তা ছাড়া দায়িত্বহীন লোক দ্বারা সমাজও অপূরণীয় ক্ষতির সম্মূখীন হতে পারে। দায়িত্ব সচেতনতা সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। অন্যান্য প্রাণীর জীবন নির্দ্দিষ্ট কোন না কোন ছকে বাঁধা। স্বেচ্ছায় এরা জীবনে বা পরিবেশে তেমন কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। কিন্তু মানুষ তার কর্তব্যের পরিধিকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত বা সংকুচিত করতে পারে।

দায়িত্ব পালনে পূর্ব প্রস্তুতি আবশ্যক এবং তা খুবই ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। অবশ্য হঠাৎ করে কোন দায়িত্ব এসে গেলে তখন অবস্থা বুঝে সাধ্যমত ব্যবস্থাদি নিতে হয়। দায়িত্ব ছোট বড় দু'ই হতে পারে। তাই দায়িত্ব অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হয়। দায়িত্বকে স্বল্পস্থায়ী, দীর্ঘস্থায়ী এমন কি চিরস্থায়ী এসব ভাগেও ভাগ করা যায়। দায়িত্ব ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক হতে পারে। এসবের উপরই প্রস্তুতি নির্ভর করে। এসবের মাঝে সদা সুসমন্বয় বজায় রাখতে হয়। নতুবা বিচ্ছিন্নতা ও বিভ্রান্তির পথ প্রশস্ত হতে পারে।

মোমেন মুত্তাকীদের কাছে আল্লাহ্‌র দেয়া দায়িত্ব সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। সুষ্ঠুভাবে তা পালনই তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ দায়িত্বের দু'টো প্রধান অঙ্গ হলো প্রতিষ্ঠানিক ও অপ্রতিষ্ঠানিক দিক। দু'টোতেই শিক্ষা, প্রশিক্ষণ সেমিনার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকে।

ইসলামে আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের প্রধান পরিচালক হয়ে থাকেন নবী। তাঁর তিরোধানে স্থলাভিষিক্ত খলীফার উপর সে দায়িত্বভার অর্পিত হয়ে থাকে। এ দায়িত্ব খুবই মহৎ, খুবই ব্যাপক। বস্তুতঃ নবী বা খলীফা হয়ে থাকেন জামাত পরিচালনার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ও শক্তি। তাঁরা জামাতের অগ্রগতিকে বেগবান রাখতে ও সাংগঠনিক ক্রিয়া-কলাপকে সময়োপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে থাকেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বেলায়ও এর কোন ব্যতিক্রম নেই। উল্লেখ্য যে, এই জামাত বর্তমানে চতুর্থ খলীফাতুল মসীহ হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

জন্ম লগ্ন থেকে এই জামাত আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশ্বময় প্রকৃত ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুনর্বাসনের মহান দায়িত্ব পালন করে চলেছে। ফলে প্রতিবছর বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের হাজার হাজার লোক বয়াত গ্রহণ করছেন। এতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে বা হতে পারে তা সামাল দেয়ার জন্য বর্তমান খলীফা ১৯৮৭ সালের ৩রা এপ্রিল 'ওয়াকফে নও' নামে একটি বিশেষ পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তাতে তিনি সম্ভাব্য পিতামাতাকে সন্তান জন্মিবার আগেই অর্থাৎ সন্তান মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় জামাতের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করতে আহ্বান জানান। প্রথমে তিনি দু'বছরে ২ হাজার 'ওয়াকফে নও' চান। পরে তিনি ৪ বছরে ৫ হাজার ওয়াক্‌ফে নও চান। তৎপর তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বর্দ্ধিত করেন। তাতে এই স্কিমও দীর্ঘ ভবিষ্যতের জন্য চালু হয়ে যায়। তাই ওয়াকফে নওদের সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। ইন্‌শাল্লাহ্।

ইতিহাসে দেখা যায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে দৈহিকভাবে কুরবান করতে এগিয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তা পশু কুরবানীতে নির্দিষ্ট করেন। হযরত মরিয়মের মা সন্তান গর্ভে থাকা কালে ধর্মের সেবার জন্য ওয়াকফ্ (উৎসর্গ) করেন। এসব উৎসর্গ ব্যক্তিতে সীমিত ছিলো বলা যায়। আল্লাহ্ এ ত্যাগ ও কুরবানীকে কবুল করে তাঁদেরকে অফুরন্ত মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত সুষ্ঠুভাবে বিশ্বব্যাপী আদর্শিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে একটি বড় নিষ্ঠাবান কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার জন্য ওয়াকফে নও স্কীমকে সর্বতোভাবে কার্যকর করে চলেছে। এটি সমগ্র বিশ্বে একটি অদ্বিতীয় পরিকল্পনা। আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে এত বড় ও মহান পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি আর কোথাও খুঁজে যাওয়া যাবে না। এ জামাতে বয়স্কদের ব্যক্তিগতভাবে ওয়াকফ করার নিয়ম প্রথম থেকেই চালু আছে। 'ওয়াকফে নও' স্কীমের বৈশিষ্ট্য হলো সন্তান মাতৃগর্ভে থাকাকালেই পিতামাতা কর্তৃক জামাতের খেদমতের জন্য ওয়াকফ করা। বড় হয়ে অর্থাৎ অভিমত দেয়ার যোগ্য হলে সন্তানকে দ্বিধাহীন চিত্তে তা মেনে নেয়া বা বাতেল করার সুযোগ দেয়া হয়। এই পরিকল্পনায় বাচ্চাদেরকে প্রথম থেকেই ব্যাপকভাবে গড়ে তোলার প্রশস্ত সময় ও সুযোগ মিলে। তাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো একদল 'সদা প্রস্তুত' কর্মী বাহিনী তৈরি করা। তারা যে সফলকাম হবে সে 'গ্যারান্টি' সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ দিয়ে রেখেছেন। কোরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ (বাংলা তর্জমা) 'তোমাদের মধ্যে এমন এক দল হউক যাহারা কল্যাণের দিকে আহবান করিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্য নিষেধ করিবে ; ইহারাই সফলকাম।' (৩ঃ১০৫)

১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে ওয়াকফে নওয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে (বালক বালিকা মিলে) ১৫,০২৪ জন। একই সময়ে বাংলাদেশে মোট সংখ্যা হলো ২০৪ জন। তন্মধ্যে বালক হলো ১৩৮ ও বালিকা হলো ৬৬ জন। এদের শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে প্রধানতঃ জামাতের 'মুরব্বী মোবাল্লেগ-এর [এ'দুটোই হলো জামাতের তালীম তরবীয়ত ও প্রচার কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা] প্রয়োজন মিটানো। এখানেই শেষ নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পেশার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরা দক্ষতার পরিচয় বহন করবে। এদেরকে মেধা এবং ঝোঁক দেখে শিক্ষা দেয়া হবে। এদের মধ্য হতে ইন্‌শাল্লাহ শত শত জাফরুল্লাহ (রাঃ) (যিনি ছিলেন পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী, জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি, বিশ্ব আদালতের প্রধান বিচারপতি ইত্যাদি) এবং প্রফেসর সালাম (নোবেল বিজয়ী প্রথম মুসলমান বিজ্ঞানী) বের হয়ে আসবে। সর্বোপরি এরা ছিলেন ইসলামের নিষ্ঠাবান খাদেম। ওয়াকফে নওয়ের সদস্যরা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখার সাথে সাথে আচার আচরণের মাধ্যমে পাক্কা মোমেন মুক্তাকীর জ্বলন্ত উদাহরণ কর্মক্ষেত্রে ও বৃহত্তর সমাজের সামনে তুলে ধরবে। ইন্‌শাল্লাহ্ এদের প্রভা ও প্রভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। তাতে ক্রমাগত যে পরিবেশ সৃষ্টি হবে তা মুরব্বী, মোবাল্লেগ ও মোয়াল্লেমদের কাজকে সহজতর করে তুলবে। এদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ সবই জামাতের নিয়ন্ত্রণে হবে। তাদের মাতৃ ভাষা ছাড়াও আরবী, উর্দূ শিখতে হবে। এমন কি কিছু কিছু ওয়াকফে নও সদস্যকে রেডইন্ডিয়ান এবং অষ্ট্রেলিয়ার প্রাচীন অধিবাসিদের ভাষা শিখেই তাদের মাঝে প্রবেশ করতে ও তাদের অন্তর জয় করতে হবে। প্রধানতঃ এ প্রকল্পের সদস্যদেরকে চতুর্মুখী কাজ করতে হবে। যেমন ঃ (১) জীবনের পদক্ষেপে তাকওয়ার চিহ্ন থাকবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে অগ্রসর হবে। (২) সুষ্ঠ কর্মসূচীর মাধ্যমে জামাতের তালীম তথা শিক্ষার প্রয়োজন মিটানো। এর গুরুত্বপূর্ণ দিক হবে সবার নৈতিক ও

আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সাধন। (৩) তরবীয়ত অর্থাৎ অর্জিত শিক্ষাকে ব্যবহারিক জীবনে কার্যকর করার কলাকৌশল আয়ত্ব করা এবং (৪) চতুর্থ কাজ হবে তবলীগের (প্রচার) কাজকে ক্রমাগত সম্প্রসারিত ও জোরদার করা। সংক্ষেপে বলা যায় ৪'ত' (তাকওয়া, তালীম, তরবীয়ত ও তবলীগ)-এর দায়িত্ব পালন করা। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, এসবকে অবহেলার কারণেই নবীগণের জামাতের পতন ঘটেছে, ঘটছে। বস্তুতঃ এ পতনের চিহ্নিত পথকে রুদ্ধ করা এ কর্মীদলের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হবে।

এই কর্মীদলের উপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিলে আমাদের সবার কর্তব্য শেষ হবে না। যখন দলে দলে লোক সত্য ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে তখন মোমেনদের (কারো জন্য ব্যতিক্রম নয়) সবারই যে কি বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হবে আল্লাহ্ তা নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন। কোরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ (বাংলা তর্জমা) যখন আল্লাহ্র সাহায্য এবং বিজয় আসিবে এবং তুমি লোকদিগকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে, সুতরাং – তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রসংশাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি পুনঃ পুনঃ তওবা গ্রহণকারী' (১১০ঃ২-৪)।

প্রশ্ন জাগতে পারে যখন দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করবে তখন ইতিমধ্যে যারা ইসলামভুক্ত আছে বা হয়েছে তাদের প্রতি এ আদেশ কেন ? সংক্ষেপে বলা যায় এর উদ্দেশ্য হলো নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করা। কেননা, দলে দলে যারা আসছে তারা ইসলামের অনেক বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত নন। তাদের মাঝে পূর্বতন ধর্মের ধ্যান-ধারণাও বাসা বেঁধে আছে। ওসব দূর করা একান্ত প্রয়োজন। নবাগতরা ইতিমধ্যে যারা ইসলামে আছে তাদের আচার আচরণকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে থাকবে। তখন যদি চতুর্দিকে মোমেন মুক্তাকীদের দেখতে পায় তবে তাদের পক্ষে নিজেদের শুধরে নেয়ার পরিবেশ পাবে। তা না হলে নব দীক্ষিতদের দ্বারা পূর্বগামিরাই প্রভাবিত হয়ে পড়বে। এতে বহু বিদাতের অনুপ্রবেশ ঘটার সুযোগ হয়। ইতিহাসেই নয় বর্তমান মুসলমানদের জীবনেও তা-ই ঘটছে। এরই পরিণতি করব পূজা, মাজারে বাতি জ্বালানো, মিলাদ মাহফিল, কুলখানি ইত্যাদি। দলে দলে আগমন যেমন বিজয়ের চিহ্ন বহন করে তেমনি নবাগতদের সঠিকভাবে সামাল নিতে না পারলে তাদের মাধ্যমে পতনের বীজ রোপিত হওয়ারও সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। ওয়াকফে নও প্রকল্পের সদস্যগণ অতন্দ্র প্রহরীরূপে ঐ দরজা রুদ্ধ করে রাখবে। আমরাও কিভাবে তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারি আল্লাহ্ উপরোক্ত আয়াতগুলোতে ঐ শিক্ষাই দিয়েছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য সদস্যাগণ জ্ঞানে, গুণে ও কর্মে বড় হয়েই ক্ষান্ত হবে না, তারা ধর্মে তথা আদর্শেও বড় হবে। বস্তুতঃ তাদের সব কিছুই ধর্মীয় বিধানে তথা কোরআন ঘোষিত শিক্ষা ও আদর্শের আলোকে পরিচালিত হবে। আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে তোমার ইচ্ছায় জীবন যাপন ও বড় হওয়ার তৌফীক দান করো। আমীন!

মানব জীবনের পরিধি

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

"একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, মানব জীবনেরও পরিধি আছে। ইহাকেও দৈর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চতা বা গভীরতায় ভাগ করা যায়। শুধু তাই নয় জীবনকে সার্থক করে তুলতে ঐ সব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানও দখল করে আছে। বরং ঐ সবের পরিমাপ মানব জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো কি না যাচাইয়ের কষ্টি পাথর রূপে বিবেচিত হতে পারে। অবশ্য জীবনের দৈর্ঘ, প্রস্থ, গভীরতা, গজ, ফুট, ইঞ্চি দিয়ে বিচার হয় না। এ সব বিচারের ভিন্ন মীযান ও মানদন্ড রয়েছে যা নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা হচ্ছে।

জীবনের দৈর্ঘ ঃ জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত যে যতদিন বাঁচে ইহাকেই তার জীবনের দৈর্ঘ বলা যেতে পারে। জীবন মাত্রই এই দৈর্ঘের অধিকারী। কিন্তু মানব জীবনে ইহার বিশেষত্ব রয়েছে। মানব জীবনে প্রতিটি মুহূর্তের যে, মূল্য রয়েছে অন্যান্য জীবের বেলায় তা বড় একটা দেখা যায় না। যে শিশু সবেমাত্র দুনিয়াতে পা বাড়িয়েছে সে-ও তার মা বাপের জীবনের গতি ধারায় বহু বড় বড় পরিবর্তনের গোড়া পত্তন করতে পারে। যতই সে বড় হতে থাকে সময় তার নিকট ততই অর্থপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠে। মানব জীবন শুধু অন্ধ প্রবৃত্তির (Instinct) তাগিদে চলে না। এখানে রয়েছে বুদ্ধি, সাধনা ও কর্মের বিরাট খেলা। তার অন্তর-শক্তি (Capacity) অনেক খানি স্বাধীন। তার জীবনের সার্থকতা শুধু দৈর্ঘের উপর নির্ভর না করে সাধনা ও সময়ের সদ্ব্যবহারের উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। এজন্য তাকে জীবনের প্রতি পলে অনুপলে সাবধান থাকতে হয়–যা অন্য জীবের বেলায় প্রয়োজন হয় না। জীবন হতে ঐ সাবধানতাকে বাদ দিলে অনেক দিন বেঁচে থাকলেও জীবনের দৈর্ঘ অনেকখানি কমে যেতে পারে।

আমাদের বাঁচার দু'টো দিক আছে–নিজের জন্য বাঁচা আর দশের জন্য বাঁচা। কারো যদি জীবনের লক্ষ্য হয় শুধু নিজের জন্য বাঁচা তবে মৃত্যুর সাথে সাথে তার স্মৃতিও মুছে যায়। তার জীবনের দৈর্ঘ অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় মৃত্যুর সাথে সাথেই খতম হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যখন দশের জন্য, সমাজের জন্য বাঁচে তখন মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর স্মৃতি লোপ পায় না। অনেক সময়ে মৃত্যুর পর তিনি আরো বড় হয়ে ওঠেন। কারণ ব্যক্তি মরলেও সমাজ বেঁচে থাকে। সমাজ তার খাদেমকে সহজে মরতে দেয়া না ; ভুলতে পারে না। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, জৈবিক জীবনের দৈর্ঘ ইচ্ছামত বাড়ানোতে অবশ্য আমাদের তেমন কোন হাত নেই। কিন্তু কর্মের মাধ্যমে, আদর্শের অনুসরণে জীবনের দৈর্ঘকে মৃত্যুর গণ্ডী পার করে নেওয়ার শক্তি স্রষ্টা শুধু মানুষকেই দিয়েছেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে মানব জীবনের দৈর্ঘকে গণিতের অংকে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।

জীবনের প্রস্থ ঃ মানব জীবনের প্রস্থ নির্ভর করে প্রেম দিয়ে সে নিজেকে কতটুকু ছড়িয়ে দিতে পারে ; আর বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে কতটুকু উপলব্ধি করতে পারে তার ওপরে। তার প্রেম নিজের স্ত্রী পুত্র, মা বাপ ও অন্যান্য

আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে আবার এই সীমানা অতিক্রম করে পাড়াপরশি, দেশ ও জাতির সীমানা পাড়ি দিয়ে সমগ্র মানবতাকেও গ্রহণ করতে পারে।

জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার উপাদান অন্যান্য জীবের মাঝে আছে বলে বুঝা যায় না ; কিন্তু আদম সন্তানের এজন্য রয়েছে উর্বর মন ও মস্তিষ্ক। বিশ্ব-জগতের আবর্তন বিবর্তন তার মন মস্তিষ্কে গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারে। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম পরমাণুকেও সে অবহেলা করতে পারে না। প্রেম, বুদ্ধি, জ্ঞানের প্রসার দিয়ে জীবনের প্রস্থ যত বাড়িয়ে নেওয়া যায় ততই ইহা সুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠে। তখন জীবনের দৈর্ঘ কম হলেও তত যায় আসে না। অবশ্য এই দৈর্ঘ অর্থে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনকেই বুঝতে হবে। সাধনার উপরেও জীবনের প্রস্থ অনেকখানি নির্ভর করে। সাধনার শক্তি স্রষ্টা মানুষকে উদার হস্তে দিয়েছেন অন্যান্য জীবকে তা দেন নি।

জীবনের গভীরতা ঃ নীতির সাথে, আদর্শের সাথে মানব জীবনের যে সম্বন্ধ উহার দ্বারাই গভীরতা পরিমাপ হতে পারে। এই গভীরতার দু'টো দিক আছে। প্রথমত ঃ যে জীবন যত গভীরভাবে কোন নীতি বা আদর্শের সাথে জড়িত সে জীবনে ঐ নীতি বা আদর্শ তত নিবিড়ভাবে প্রতিফলিত হবে। দ্বিতীয়ত ঃ ঐ নীতি বা আদর্শের প্রতিষ্ঠাতার জন্য ঐ ব্যক্তিকে তত বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হয়। এখানেও অন্যান্য জীব হতে মানব জীবনের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অন্য কোন জীবেরই নীতি বা আদর্শের কোনই বালাই নেই। তেমন কোন প্রয়োজনও নেই। কিন্তু আদর্শচ্যুত হলে, নৈতিক জীবনকে অস্বীকার করলে মানব জীবন শুধু নিরর্থকই হবে বলে মনে হয় না – অচল হয়ে পড়ারও বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

মানব জীবনের উচ্চতা ঃ উচ্চাশা, মহিমাময় স্বপ্ন, গৌরবময় কল্পনা, ক্ষুদ্রতা, হীনতা ইত্যাদিকে মানব জীবনের উচ্চতার পরিমাপ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। উচ্চাশা বড় কল্পনা এসব হলো এর যোগান্তের দিক আর হীনতা, ক্ষুদ্রতা ইত্যাদি হলো এর বিয়োগান্তের দিক। প্রথমটি বাড়াতে হবে আর দ্বিতীয়টিকে জীবন থেকে তাড়াতে হবে। তবেই জীবনের উচ্চতা বেড়ে চলবে ! এখানে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনের দৈর্ঘ, প্রস্থ, গভীরতা ও উচ্চতা একের সাথে অপরের নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। তা'ছাড়া সাধনা দ্বারাই এসবের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়ে থাকে।

জীবনের পরিধি নিয়ে আলোচনা করলে আত্মসমালোচনা ও আত্মোপলব্ধির পথ সহজ হয় ; জীবনের উদ্দেশ্য হৃদয়ংগম করতে প্রেরণা আসে। ঐ প্রেরণাকে কর্মে রূপান্তরিত করার জন্য যেমনি এগিয়ে আসতে হবে তেমনি পরম করুণাময় স্রষ্টা যিনি মানব জীবনের পরিধি এত সম্ভাবনাময় করে দিয়েছেন তাঁর দরবারেও মদদ মাংগতে হবে।"

(মাসিক বিকাশের জুলাই-আগষ্ট '৯২ সংখ্যার সৌজন্যে)

পরিশিষ্ট

(১)

বাণী চিরন্তন

আল্ হাদীস

যারা সংযত ও চরিত্রবান তারা যে বংশের বা দেশের লোক হোক না কেন তারাই আমার স্বজন।

সত্যবাদিতা সুকর্মের পথ দেখায় আর সুকর্ম বেহেশ্‌তের পথ দেখায়।

মুর্খের উপাসনা অপেক্ষা জ্ঞানীর নিদ্রা শ্রেয়ঃ।

আত্মজয়ের চেষ্টাই সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ।

স্বীয় সম্প্রদায়কে ভালবাসা স্বজন-প্রীতি নয়।

স্বীয় সম্প্রদায়কে অত্যাচার বা অসৎ কর্মে সাহায্য করাই স্বজন-প্রীতি।

আল্লাহ্‌কে ভালবাসার ইচ্ছা থাকলে প্রথমে মানুষকে ভালবাসতে শিখ।

চরিত্রের উৎকর্ষ অনুযায়ী খোদাতা'লা মানুষকে উন্নতি দান করে থাকেন।

প্রত্যেক মুসলিম নারী পুরুষের জন্য এলেম হাসেল করা ফরয।

অন্তর দিয়ে সত্য উপলব্ধি করা, মুখ দিয়ে প্রকাশ করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মারফত সেই অনুযায়ী কাজ করার নামই ঈমান।

কর্মহীন ঈমান ও ঈমানহীন কর্মকে আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না।

(২)

মনীষীদের কথা

ছাত্রদের সামনে শিক্ষকের একটা মিথ্যা কথা বলার অর্থ তার শিক্ষার সমস্ত মূল্য বিসর্জন দেওয়া। – রুশো

আমাদের জীবন আমাদের ইচ্ছার উপর নয়, আমাদের কর্মের উপর দন্ডায়মান। – লিথা পোরাম

সময় মূল্যবান, কিন্তু সত্য সময় অপেক্ষা বেশী মূল্যবান। – ডিজরেইক

অসৎ আনন্দের চেয়ে পবিত্র বেদনা মহৎ। – হোমার

দুষ্ট লোকেরা তাদের গড়া নরকেই বাস করে। – টমাস ফুলার

যুক্তিতে না পারলে শক্তিতে দেখে নেবো – এটাই বর্বর নীতি। – শেখ সাদী

তোমার জীবনে ঘটেনি বলে কোন অলৌকিক ব্যাপারকে উড়িয়ে দিও না। – রোঁমা রোলা

সংখ্যা কেবল তখনই কাজ দেয় যখন জনগণ আবদ্ধ হয়েছে সংগঠনে, চালিত হচ্ছে জ্ঞান দিয়ে। – কার্ল মার্কস্

দেহ থেকে পুঁজ অথবা টিউমার বের করার চেয়ে মন থেকে কুচিন্তা বের করে দেয়ার প্রয়োজন অধিক। – এপিক টটাস

পৃথিবী যতবেশী পঙ্কিল পৃথিবীর সংশোধন কার্য ততবেশী পবিত্র।

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্যের নাক বোঁচা বলে প্রচারে নিজের নাক উঁচা হবে না । তবে প্রচারকারীর সময় ও জীবনের অযথা ক্ষয় হবে বৈকি। – কাশত্কার

(৩)

বিধাতা মানুষ দাও

বিধাতা মানুষ দাও যে মানুষ
সময়ের চাহিদার মত
শক্তিমান সহৃদয় সত্যনিষ্ঠ
হস্ত যার কর্মঠ সতত ;
নিজেকে বিক্রয় কভু করে নাই
পদ কিম্বা গদির মায়ায় ;
ক্ষমতা–বিকার কভু কেড়ে
নিতে পারে নাই
যার সত্য-স্নিগ্ধ মহিমায়!
নিজস্ব নীতির জোরে গতি যার
ইচ্ছাশক্তি যার গোলাম
মর্যাদারে ভালবাসে কিন্তু কভু
করে নাকো মিথ্যাকে সালাম।
বিধাতা মানুষ দাও . . . . .

ইংরেজ কবি জে, জি হল্যান্ড

দৈনিক ইত্তেফাক ১২/৮/৭২

(৪)

প্রগতি !

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

আদি কালের কথা **পড়লে খাবো**

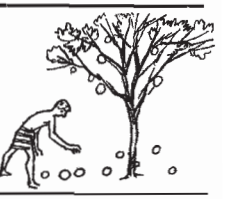

পুরা কালের কথা **পেড়ে খাবো**

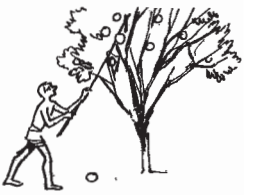

তার পরের কথা **করে খাবো**

তারও পরের কথা **কেড়ে খাবো**

একালের কথা **মেরে খাবো**

কেড়ে খেলে মেরে খেলে
ত্বরায় হয় মরণ,
পেড়ে খেলে, করে খেলে
দীর্ঘ হয় জীবন।

সহায়ক পুস্তক পুস্তিকাদি

১। কোরআন পাক

২। হাদীস শরীফ

৩। ইসলামি নীতি দর্শন — হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) লিখিত

৪। তাযকেরাতুশ্ শাহাতায়ন — ঐ

৫। তোহফায়ে গুলড়াবিয়া — ঐ

৬। The words of wisdom and purification. Islam International Publication Ltd.

৭। The 100 by Michael H. Hart

৮। সীরাতে সুলতানুল কলম ঃ মরহুম মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ

৯। মহাসুসংবাদ ঃ মূল রচনায় মরহুম মৌঃ আহসান উল্লাহ শিকদার

১০। মাসিক আহ্‌বান

১১। ফির্কবাজী, কুফুরী ফতোয়া ও ইসলাম — মোহতারাম আহমদ তৌফিক চৌধুরী

১২। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার — প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

১৩। মহা জিজ্ঞাসা — মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

১৪। আহমদীয়া মুসলিম জামাত ও ডিশ এন্টেনা — সাবেক ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ